আচক্ষুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আক্ষ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥
মহাভারত ১.২৪

কোন-কোন কবি এই ইতিহাস পূর্বে কীর্তন করেছেন,
বর্তমানে আমি করছি,
ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্য কবিরাও করবেন।

Some bards have already sung this history;
and some again are teaching it to others;
others will no doubt do the same hereafter on earth.

দীপংকর লাহিড়ী

শাশ্বত

মহাভারতের পুনর্পাঠ

মনফকিরা
www.monfakira.com

দীপংকর লাহিড়ী
শাশ্বত : মহাভারতের পুনর্পাঠ

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১৯, মে ২০১২

স্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 978-93-80542-38-6

প্রকাশক : মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত,
ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন এবং
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২, ৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.pub@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in

গ্রন্থসজ্জা ও হরফবিন্যাস : মনফকিরা

মুদ্রণ : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১ বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

৩০০ টাকা

যাঁর আশীর্বাদে
আমার মনে প্রথম মহাভারত সম্বন্ধে
অপার কৌতূহলের উদ্ভব,
সেই পরম আরাধ্যা মাতৃদেবীর শ্রীচরণে
শাশ্বত
উৎসর্গিত হল।

সূচিপত্র

এক সন্ধিৎসু মনের সংবেদ ১

কালবর্ত্মের পর্যটনলিপি ৯

মহাভারতের পটভূমি ৩৭

প্রত্নমননের সম্ভাব্য ইতিহাস ৬৫

হিমযুগ ও আন্তর্হিমযুগ ৮১

পুরাণ ও দক্ষিণাপথের সভ্যতা ৯৮

সূর্য ও চন্দ্র বংশ ১১৫

মহাভারতের মহারণ্যের কতটা সত্য
আর কতটা বিদেশিদের অবদান ১২৩

মহাভারতের চরিতাবলি ১৩৫

আদি পর্বের স্বয়ম্বর পর্বাধ্যায় ও সভাপর্ব ১৭১

প্রাক্-মহাভারত ভূ-সংস্থান ১৮০

শ্রীকৃষ্ণ : মহাভারত মহারণ্যের একমাত্র দিক্‌নির্দেশক ১৯৭

মহাভারতের পর্ব পরিক্রমা ২১৩

যুদ্ধারম্ভ ২২৭

ভীষ্মপর্ব ২৩৬

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবশিষ্ট পর্বগুলি ও সৌপ্তিক পর্ব ২৪৩

ক্রান্তিকাল ২৫৪

পরিশিষ্ট

বসুর হিসাবমতো বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় রাজন্যের প্রজন্ম-পরম্পরা ২৮০

শব্দপঞ্জি ২৯০

ভূমিকা

এক সন্ধিৎসু মনের সংবেদ

ছোটবেলায় অন্য অনেক ভারতীয়ের মতো আমারও মনে মহাভারত সম্বন্ধে দু'টি ধন্ধ ছিল। তার একটি পাণ্ডবদের বনবাস পর্বের। তৃষ্ণার্ত পাণ্ডবরা যখন এক যক্ষ-রক্ষিত জলাশয়ে জল নিতে গিয়ে যক্ষের প্রশ্নের উত্তর আগে না দিয়ে জলস্পর্শ করে একে-একে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল, তখন যুধিষ্ঠির গেলেন অকুস্থলে। সেখানে গিয়ে তিনিও যক্ষের সামনে পড়লেন। কিন্তু অনুজদের মতো আগেই জল স্পর্শ না করে মন দিয়ে শুনলেন যক্ষের প্রশ্নগুলি। পাঁচ সেট প্রশ্নের একটি সেটের প্রথম প্রশ্ন এ রূপ : সুখী কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, যে-জন সারাদিন অপ্রবাসী ও অঋণী থেকে দিবাশেষে শাকান্ন ভক্ষণ করতে পারে সে-ই সুখী। অন্য এক প্রশ্ন : আশ্চর্য কী? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, প্রতিদিন মানুষ এগিয়ে চলেছে যমালয়ের দিকে, তবু সে ভাবে যে সে অমর— এর থেকে আর আশ্চর্যের কী আছে!

আমার দ্বিতীয় ধন্ধ ছিল মৌষল পর্বের। অর্জুন যখন পতিহারা যাদব-রমণীদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরছিলেন, তখন আভির দস্যুরা তাঁদের উপর চড়াও হয়। তাদের বার-বার নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেও না-পেরে যখন গাণ্ডীব তুললেন, তখন অমিত-তেজা অর্জুন বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, তিনি কোন অস্ত্র আহ্বান করতে পারছেন না। এ-ও কি সম্ভব? এই প্রশ্ন আমাকে বার-বার পীড়া দিত। মহাভারতের এই ঘটনা বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সবচেয়ে দুঃখজনক বলে মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল এ ভাবেই জীবনের শেষ পর্যায়ে মানুষের পৌরুষ চলে যায়। ভাবতাম, কোথায় যায় আর কেন যায়!

সেই বয়সে প্রথম যে-প্রশ্নটা মাথায় এসেছিল তা হল, মহাভারত কত প্রাচীন। তবে তার উত্তর পাবার জায়গা ছিল দু'টি, গুরুজন আর শিক্ষক। কিন্তু তাঁরা যা বলতেন, তা তখনকার মতো মেনে নিলেও আর ক'-বছর পর স্কুলের শেষদিকে সেগুলি সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন মনে উঠতে লাগল। কিন্তু সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। আর্যরা কি একটা জাতি ইংরেজদের মতো? তাদের পক্ষে কি খাইবার গিরিপথ বা আরবের মরুভূমি পেরিয়ে মোহেঞ্জোদারো-হরাপ্পায় হানা দেওয়া সম্ভব? বয়স, অভিজ্ঞতা আর আহরিত তথ্য বাড়ার দরুন পার্জিটার ও তাঁর অনুগামী

ইতিহাসবিদদের অনুমিত কালগুলি সম্বন্ধে আমার যা-যা সন্দেহ, দেখলাম সে রকম সন্দেহ এসেছে অনেকের মনেই। তাঁরাও তাঁদের বিচার অনুযায়ী মহাভারতের প্রাচীনত্ব বার করতে গিয়ে প্রথমে ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব অনুমান করার চেষ্টা করেছেন। এঁদের একজন H.S. Spencer (Are the Gathas pre-Vedic?, 1965)। তিনি ঋগ্বেদের উৎস-গাথাগুলির কাল হিসাবে পৌঁছেছেন ২১,৭৮৮ খ্রিস্টপূর্বে। প্রসাদ গোখেল তাঁর ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (Antiquity and Continuity of Indian History) তৈত্তেরীয় সংহিতার একটি শ্লোকের উল্লেখ করে টিলক-এর প্রস্তাব সমর্থন করেন, বলেন, বিশেষ একটি মকর সংক্রান্তির কাল ২২,০০০ খ্রিস্টপূর্ব। সেই মকর সংক্রান্তির উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে নভোচিত্রে বিভিন্ন তারা-মণ্ডলের অবস্থান দিয়ে।

আরও বহু গবেষণাপত্রের উল্লেখ করা যায়, যেগুলির প্রকাশকাল বিগত শতকের শেষ দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে আমাদের বর্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্যে তার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ঋগ্বেদ গাথা রূপে রচিত, কালের অমোঘ নিয়মে সংকলিত এবং পরে সংহিতার রূপ ধরে একটি আদি শাস্ত্র রূপে গৃহীত হতে গেলে যে-সুদীর্ঘ কালের পরম্পরা দরকার তা পার্জিটার, তাঁর অনুগামী, এমনকী সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মাথায় আসেনি। যে-ভাবে পাণিপথের যুদ্ধের প্রাচীনত্ব বার করা হয় বা সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা থেকে তাঁর রাজত্বের কাল বার করা হয়, কেন তা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়, তা একটি রূপকের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে (কালবর্ত্মের পর্যটনলিপি)। উদ্দেশ্য, লেখকের মহাভারত পরিক্রমায় পাঠককে শামিল করা।

তবে এই পরিক্রমার উদ্যোগটা এসেছিল মূলত আমার দু'টি ধন্ধের জট ছাড়াতে গিয়ে। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের শুরুতে কলেজে পড়তে এসে PL 480 Programme কথাটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ১৯৫৪ সালের ১০ জুলাই আইসেন-হাওয়ারের এই কর্মসূচি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের বেঁধে ফেলেছিল এমন এক ঋণে, যা আমাদের শোধ করতে হয়েছে শস্তায় ভারতীয় পণ্য সরবরাহ করে বহু দিন পর্যন্ত। কারণ নামে সাহায্য হলেও এই বৈদেশিক সাহায্যের অনেকটাই দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। হয়তো আমাদের অনেকেই তখন অপ্রবাসী, কিন্তু অঋণী নই। তারপর এল বহির্গমনের কাল। এ সব পার হয়ে আমরা সুখী কি না, তার উত্তরে আজ জিজ্ঞাসা-চিহ্নটা ক্রমেই বড় হতে-হতে আকাশ ছুঁয়েছে। যক্ষের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, বরাবর থাকবে আর সভ্যতার শুরু থেকে ছিলও। দ্বিতীয় ধন্ধের জট খুলল, যখন দেখলাম রর্বাট ওপেনহাইমার বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এক নিম্নমেধার উকিলের জেরায় জেরবার হয়ে গেলেন, মাথা সোজা করে বলতে

পারলেন না, I am the father of atom bomb (Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientists, a book by Robert Jungk, first published in English in 1958)। কোথায় গেল ওপেনহাইমারের সেই পৌরুষ, যা সরবোনের এক পাত্তা না-পাওয়া ছাত্রকে পৌঁছে দিয়েছিল রুজভেল্টের পরম আশ্বাসের আসনে। কালের কবলে পড়ে তা তখন অন্তর্হিত।

ধন্ধ তো মিটল, কিন্তু এসে পড়ল শতাধিক প্রশ্ন। পার্জিটারের হিসাব ধরে যদি সহস্র খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৌঁছে যাই, তবে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, সে যুগের লোকসংখ্যায় বিশ্বযুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধ কি আদৌ সম্ভব! আর ভারতের কোথাও সে রকম কোন সামগ্রিক যুদ্ধের কোন প্রত্ননিদর্শন আছে কি? না, নেই। তবে? এই তবে-র সূত্র ধরে এল উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে প্রত্ন-অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যগুলির যুক্তিসাপেক্ষ বিচার। না, এগুলির কোন জায়গায় নেই কোন সামগ্রিক যুদ্ধের চিহ্ন। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতেও নেই কোন নিদর্শন। কিন্তু জনবসতি বিলোপের চিহ্ন আছে অনেক, আর তা প্রধানত আবহাওয়ার পরিবর্তনে। বিগত শতকের বহু দশক পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাসের, বিশেষত প্রত্ন-ইতিহাসের বিচারে এ কালের মডেল প্রয়োগ করা হত। ভূবিদ্যায় ব্যবহৃত একটি যুক্তি Uniformi-tarianism। তার অন্ধ প্রয়োগ এক সময় ভূবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এতটাই ব্যাহত করেছিল যে মহীসঞ্চার প্রকল্প সুদূর ভূত্বকীয় অতীতের এক নূতন গবাক্ষ উন্মোচন করার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল। যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দশকেই তা পুনরুজ্জীবিত হল নূতন তথ্যের আলোকে। সেখানে কম্পিউটরের ভূমিকা প্রধান। যে-প্রত্নবিদরা পার্জিটারের মতো বাস্তব-নিরপেক্ষ মডেলে ঋগ্বেদকে দাঁড় করিয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের ঠিক আগের কোন সময়ে, তাঁরা স্থান পেলেন ইতিহাসের জীর্ণ পাতায়। ১৯৩৬ সালে গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর *পুরাণপ্রবেশ* গ্রন্থে বিভিন্ন পুরাণ থেকে সংকলন করেছিলেন ভারতের পুরা-ইতিহাসের রাজন্যবর্গের প্রজন্ম-পরম্পরার এক সম্ভাব্য কালক্রম। কিন্তু সেখানেও খুব একটা যুক্তিসাপেক্ষ মডেলে পৌঁছনো গেল না, কারণ তিনি ধরেছিলেন মহাভারতের সব চরিত্রই ব্যক্তিচরিত্র, যা বাস্তবে হওয়া সম্ভব নয়। কেন, তার বিশ্লেষণ আছে প্রথম অধ্যায়ে।

তবে এই সব নূতন তথ্যের ভিত্তিতে মনে হতে শুরু করল, কালের পটভূমিতে যেমন ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ক্রমবিকাশ, তেমন কি হতে পারে না ভাষা, সমাজ, সংস্কারের? কেন পারবে না? তার প্রমাণও তো আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রে, বিভিন্ন পুরাণে, গ্রিক রচনায়। কালের রঙ্গমঞ্চে তখন মহাভারতের রূপ পরতে-পরতে উন্মোচিত হয়ে চলেছে।

এই সব ব্যাপার অবশ্য একদিনে হয়নি। এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা খুব সহজে তো

হয়ই নি, সুখকরও হয়নি। বরং অনেকের বিদ্রূপের কারণ হতে হয়েছে। ভূবিদ্যায় পেপার লিখলে তা যে পদোন্নতিতে কাজ দিত, 'তথাকথিত' শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জানাতে কসুর করেননি। কিন্তু মহাভারতের আকর্ষণ এমনই যে এত সব ভালো-ভালো কথা কানে ঢোকেনি। আমার পরিক্রমা এগিয়ে চলল নিত্য। তাতে নূতন মাত্রা যোগ হতে লাগল অভিজ্ঞতা আর তথ্য বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার আদিবাসীদের যেটুকু ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে, তা থেকে অনেক সম্ভাব্য মডেল সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। চিন, তিব্বত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, পামির, তুর্কি, নানান জায়গার নানান তথ্য যেন জানান দিয়ে চলল, মহাভারতের বিবরণ সর্বত্র বিদ্যমান। কেন যেন মনে হতে লাগল, এই পরিক্রমা পথ-পরিক্রমার মতোই, ভ্রমণ নয়। পরিভ্রমণ যাঁরা করেন, প্রথম বার তাঁদের চোখে পড়ে স্টেশনগুলি। পরের বার সেই পথে গেলে নজরে পড়ে প্রত্যেক স্টেশনের লোকজন, তাদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, খাবারদাবার ইত্যাদি। তারও পরে যদি কোন সময়ে তার একটি স্টেশনে নেমে কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার পেরিয়ে দেশের গভীরে যেতে হয়, তবে দেখা মিলতে পারে অনেক বিচিত্র বস্তু ও তথ্যের। মনে আছে, এলাহাবাদ লাইনের মুম্বাই মেইলে খান্দোয়ায় নেমে রাটলাম হয়ে যেতে হয়েছিল মেঘনগরে। বিগত শতকের ষাটের দশকে সেখান থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার পথ পার হয়ে যাদের দেখা পেয়েছিলাম, তারা বিশ শতকের শেষার্ধেও থেকে গিয়েছিল নব্যপ্রস্তর যুগে। কাজের তাগিদে এগোতে হল আর দেখা মিলল চম্বলের কুখ্যাত দস্যুদের। প্রত্যক্ষ হতে শুরু করল যোহান মেয়ার জেকব-এর মহারণ্যের মতোই এক বস্তুজাগতিক মহারণ্য। আবার কচ্ছের রান-এ ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি, কত পথ হারিয়ে গেছে মরুভূমিতে। সে পথের নির্দেশ পেতে গেলে ঘাঁটতে হয় ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার। মহাভারতেও তো তেমনি। ভীষ্মের বৈয়াঘ্র-পদ্য গোত্র কেন হয়, কে বলে দেবে! পথের আঁকেবাঁকে এমনি কত না-জানা কথা, না-জানা কাহিনীর হাতছানি। তার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার কোথায়? সবার ওপর সংস্কৃত ভাষা। প্রচলিত ভাষার সংস্কার সাধন করতে গিয়ে কত কথাই যে হারিয়ে গেছে, তার কোন হদিশ দেননি যাস্ক। আর তাঁর পূর্বাচার্যদের রচনার খবরও নেই কোন। আছে শুধু উল্লেখ, নাম ছাড়া। পরিচয়-সংখ্যা দিয়ে।

ভূবিদ্যায় তো পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যার মতো পরীক্ষা, নিরীক্ষণ ও অনুমানের পথে অনুসন্ধানের রীতিবদ্ধ পদ্ধতি সম্ভব নয়, সেখানে একমাত্র পদ্ধতি Uniformitarianism। কিন্তু তারও সীমাবদ্ধতা অনেক। তবু মনে হল, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তো এগোনো যেতে পারে। তাতেও থেকে যায় অনেক বিতর্কের সুযোগ। Toynbee-র সতর্কবাণী আমার ব্যক্তিগত অনুশীলন-পদ্ধতিতে অনেকটা সঙ্গতি

আনল। ভূবিদ্যার বক্তব্যও তো এমনি। সেখানে অনেকগুলি অনুমিতির মধ্যে একটি কি দুটি, যা অধিকাংশ তথ্যকে ব্যাখ্যা করে, সেগুলি নিয়ে ভূবিদ এগোতে থাকেন। এ ভাবেই এগোই না কেন! ভারতের ভূখণ্ড যেমন বিশাল, ভূতাত্ত্বিক কালও তেমনি বিপুল। সেই বিস্তীর্ণ কালে যেমন Uniformitarianism সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য নয়, তেমনি ইতিহাসের পদ্ধতিগুলিও শুধু ভারত কেন, পৃথিবীর কোথাও সমভাবে প্রযোজ্য নয়। মাতার পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়, পৈতৃক বংশ-পরিচয়ের পাশাপাশি এ যুগেও বিদ্যমান। এক কন্যার একাধিক পতি, তার নজিরও আছে। এ সব নিয়েই যেমন এ যুগ, মহাভারতের যুগও তেমনি— ভাবতে অসুবিধা কোথায়! তবে যে-অসুবিধা পদে-পদে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা হল ইংরেজ ঐতিহাসিকদের প্রশিক্ষণের জড়ত্ব। আবার ইয়োরোপীয় আর মার্কিন বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ অনেক নূতন পথের সন্ধান দিল।

আর এ ভাবেই বিকশিত হয়ে চলল *শাশ্বত*। ক্রমে তার পরিধি বাড়তে লাগল। ধূসর অতীতের পটভূমিতে স্পষ্ট হতে থাকল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রকৃতি আর গতি-বেগ। সদাঘূর্ণমান কালচক্র, মহাভারতের কালে যা ছিল পুরাণ-বর্ণিত, তা একসময় মহাভারতের কাল পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ঐতিহাসিক কালে। এলেন বুদ্ধ, তারপর গুপ্ত সাম্রাজ্য, তুর্কিরা, মুঘল রাজত্ব, ইংরেজ আর বর্তমান শতক। গেল কতগুলি মহাযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধও। কালের গতির মতো মহাভারতের গতিও স্তব্ধ হয়নি। শুধু মহাভারতের ভারত বা জম্বুদ্বীপের বদলে এসেছে সারা পৃথিবী। সমস্যাগুলি কিন্তু থেকেই গেছে। আন্তর্জাতিক ঋণের বোঝা মানুষকে মনে পড়িয়ে দেয় যুধিষ্ঠিরের সেই উক্তি— *দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ। অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥*

শাশ্বত-এর পথ ধরে মহাভারত পরিক্রমায় বেরোলে হাতের কাছে একটি মহা-ভারত থাকলে সুবিধা হবে। তবে মহাভারত প্রকৃতপক্ষে সংহিতা। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই সংহিতা রচনার কাজ করেছেন, তা আমার মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে, একটি জীবগোষ্ঠীর মতো তার ক্রমে বিকাশ ঘটেছে চারণকবিদের গানে-গানে, মুখে-মুখে। লিপিবদ্ধ করার কাজটা হয়েছে অনেক পরে, তা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের যে-কোন সময়ে হয়ে থাকতে পারে। তাতে এই অতিমহাকাব্যের প্রতিপাদ্যের কোন হেরফের ঘটে না। হমো সেপিয়েন্‌সের চারটি জীবনশৈলীর স্তর তার মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে— শুরু নিষাদ দিয়ে, যারা পশুশিকার করে আহার্যের সংস্থান করত। তার উপরের উন্নততর স্তর শবর, যারা পশুপালন করত ও উদ্ভিদজাত খাদ্য খেত। তার চেয়ে উন্নত স্তর দ্রাবিড়। খাদ্যের সমস্যা মিটে যাওয়ায় তারা আশ্রয় গঠনে ও জীবনযাত্রাকে আরও সুখপ্রদ করতে সচেষ্ট হল। তার চেয়ে উন্নত স্তর আর্য, যারা জাবাল-সত্যকামের নির্দেশিত

সাংসারিক প্রয়োজন মেটাবার পর অন্তরের দাবি মেটাতে উদ্যোগী হল। আশা রাখি, পাঠক এই চারটি স্তর পায়রার খোপ (pigeon hole) বলে ভুল করবেন না। প্রত্যেক স্তরের সুদীর্ঘ মেয়াদে নিষাদ যেমন তার শিকারপদ্ধতির ক্রমে-ক্রমে উন্নতি করেছে, তেমনি শবর করেছে অস্ত্রনির্মাণ, পশুপালন ও উদ্যানপালনে। এ ভাবেই দ্রাবিড় আর আর্যরাও। আর পাঠক ধরে নেবেন না মানুষের বাসের উপযোগী সব জায়গায় সব মানবগোষ্ঠী একই কালে প্রতিটি স্তর পেরিয়ে আর্যত্বে পৌঁছেছিল।

এগুলি মাথায় থাকলে রাজশেখর বসুর *মহাভারত*-এই কাজ হবে। তবে পুরা-কালে বর্ণিত বলে যে-সব কাহিনী আছে, তার অনেক সময় একটু বিস্তারিত বিবরণ পেলে সুবিধে হয়। এই উদ্দেশ্যে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের *মহাভারতম্* অনেকের কাছে কাজের মনে হলেও আমার তা মনে হয়নি, কারণ সেখানে অন্বয় ও ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনায় জড়িয়ে পড়ে মূল আখ্যান থেকে দূরে চলে যাবার সম্ভাবনা পদে-পদে। সে দিক দিয়ে কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীর ইংরেজি সম্পূর্ণ অনুবাদ অনেক কাজের। প্রায় ১২৫ বছর প্রাচীনত্বের এই মহাগ্রন্থ ইন্টারনেটে বিনাব্যয়ে পাওয়া যায়, এবং পর্ব ও পর্বাধ্যায় সহজে ডাউনলোড করা যায়।

মহাভারতের উপাখ্যানে *কিরাত* নিষাদ স্তরের। তার উন্নতির পরিচায়ক অর্জুনের তপস্যায় মহাদেবের কিরাত রূপে আবির্ভাব। একলব্যও নিষাদ। আবার নলরাজা নিষাদ। শবরের পরিচয় সে ভাবে নেই। দ্রাবিড় অবশ্য অনেক। বস্তুত পঞ্চজন, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে যার সমীকরণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে, তারা দ্রাবিড়। আর্য স্তরে অবক্ষয়ী কৌরবরা, আবার অবক্ষয়ী দ্রাবিড় স্তরে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শৃগাল বাসুদেব ইত্যাদি। পাঠকের মনে রাখা দরকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সভ্যতার স্তর নয়, বৃত্তির স্তর। *জনজাতি* কথাটি আজকাল ব্যবহৃত হয় tribe বোঝাতে। কিন্তু মহাভারতের ঘটনার যুগে জন বোঝাত উন্নতিশীল জনগোষ্ঠী। আবার উন্নতির চরমে পৌঁছে যে-কোন জাতি অবক্ষয়ের ফলে পূর্বতন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে ভেঙে যেত। তারা জন নয়, দস্যু। মৌষল পর্বের আভিররা এ রকম গোষ্ঠী, সম্ভবত এ যুগের বেদুইনরাও।

পুরাজীববিদ্যয় প্রজাতির উদ্ভব বহু স্থানে যুগপৎ না-হয়ে এক জায়গায় বলে ধরা হয়। রামাপিথিকাস, শিবপিথিকাস শিবালিক পর্বতের স্তরক্রমে পাওয়া গেছে বলে ধরে নেওয়া যায় না যে অস্ট্রালোপিথিকাস হয়ে হমো ইরেক্টাস হয়ে হমো সেপিয়েন্‌স সেখানে আলাদা করে হয়েছে। তা যদি হত, তবে মানুষের অন্য গণ (genus) হত। নর্মদা অববাহিকার হমো ইরেক্টাস শিবালিকের রামাপিথিকাসের উত্তরপুরুষ হবার সম্ভাবনা নেই সেই একই কারণে। প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম বৈচিত্র্য। ধারাবাহিকতা হারিয়ে গেলেই প্রকৃতি পরিবর্তন (mutation) ঘটায়। গোরু

আর তিমি জীববিদ্যার একই পরিবারভুক্ত প্রাণী আজ সাধারণ ভাবে বোঝার উপায় নেই। মানুষের ক্ষেত্রে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য গোত্র, প্রবর ইত্যাদির ব্যবহার।

এখানে বলে নেওয়া দরকার, আমাদের আলোচনা প্রধানত ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম আর দক্ষিণ এশিয়ায় সীমাবদ্ধ, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় এগোইনি।

বিগত শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি সময়ে *শাশ্বত* প্রকাশিত হয় *দরগা রোড* পত্রিকায় তিনটি পর্বে, আর প্রকাশিত হয় *ময়ূখ* পত্রিকায় চারটি পর্বে। সেগুলি যে-সব সমালোচনা ও পরামর্শ আকর্ষণ করেছিল, বর্তমানে গ্রন্থ রূপে প্রকাশের কালে সেগুলি যথাযথ বিচার করে পরিমার্জিত করা হয়েছে মূল রচনাটি। পত্রিকায় প্রকাশের সময় চোখে পড়েছিল বাঙালি পাঠক যত বিদ্বানই হন না কেন, রচনা বাংলায় হলে প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জির পাতা উলটে দেখতে তাঁর বড়ই অনীহা। সে জন্য গ্রন্থে পাদটীকায় উল্লেখ্য গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল। লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে সর্বাগ্রে সমগ্র বক্তব্যের সার (abstract) দিয়ে দিলে ভালো হবে। তাই প্রথম অধ্যায়টি রূপক আশ্রয় করে রচিত। প্রথম থেকে পঞ্চম অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে *কালপ্রতিমা* পত্রিকায় ২০১০-১১ সালে। মাঝে-মাঝে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার অবশ্য অনেক পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। যেখানে পেরেছি, সেখানে নিকট-তম বাংলা প্রতিশব্দটি দিয়েছি, কিন্তু যেখানে অনেক ভেবেও প্রকৃত অর্থদ্যোতক কোন বাংলা শব্দ পাইনি, সেখানে ইংরেজিই রাখতে হয়েছে, এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

শাশ্বত গ্রন্থরূপে প্রকাশের পেছনে ড. ভূমেন্দ্র গুহের প্রেরণা এবং মনফকিরা-র কর্মীদের উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রম আছে। কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো লৌকিকতার ঊর্ধ্বে এঁরা। ধন্যবাদ জানাই বেসু ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের।

দীপংকর লাহিড়ী
lahiridipankar@gmail.com
কলকাতা
২০১২

প্রথম অধ্যায়

কালবর্ত্মের পর্যটনলিপি

ক

পাঠক! ভাবুন আপনি ট্রেনে করে দূরযাত্রায় চলেছেন। আপনার কামরায় অনেক সহযাত্রী। কিন্তু আপনি দেখছেন সবাই ঠিক আপনার মতো নয়। আপনার যেন সব কিছুতেই কৌতূহল। জানালার বাইরে অপসৃয়মান ভূদৃশ্য, তার মাঝে গ্রাম, গ্রামের মানুষ, পুকুরে অবগাহনরতা বনিতা, ক্রন্দনরত শিশু, আবার কোথাও ক্ষেত, শস্যহীন নগ্ন, কোথাও আবার শস্যভারে উপচীয়মান কৃষিক্ষেত্র কিংবা কর্ষণরত লাঙলধারী কৃষক। সবই আপনার নজরে পড়ছে। তবে কোন-কোনটা মনে ধরছে, হয়তো বহু বছর পরেও কোন অবকাশ-মুহূর্তে সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠবে। আবার কোনটা হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো। কিন্তু সব সহযাত্রীই কি আপনার মতো? মোটেই না। কেউ হয়তো চলমান কামরায় পুরো সংসার পেতে বসেছেন। পোঁটলা খুলে খাওয়াদাওয়া চলছে। শেষ কোন্ স্টেশন গেল তাই খেয়াল করেননি, যদিও সেটা পার হবার সময় চা খেয়েছেন, পরিবারের সবাইকে খাইয়েছেন।

আপনার এ যাত্রা কল্পনালব্ধ, বিজ্ঞানের ভাষায় পরোক্ষহরিত, ইংরেজিতে যাকে বলে vicarious। অগ্রজ সাহিত্যিকদের অনেকেই তো এ রকম যাত্রায় শামিল হয়েছেন, বিভূতিভূষণের *অভিযাত্রিক*-এর কথা ধরুন না! যাত্রায় না-হলেও বাগ্-বিতণ্ডার কথা ধরলে কমলাকান্ত আছেন, স্বীকারোক্তির কথা ভাবলে De Quincey। অর্থাৎ এ ভাবে যদি আমি আমার যাত্রার বিবরণ দিই, তবে আশা রাখি, পাঠক কিছু দোষ নেবেন না। তা হলে দেওয়া যাক!

খ

এ এমন একটা পথ, যার শুরু নেই, শেষ আছে কি না, তা-ও জানা নেই। শুধু আমার কেন, প্রায় সবারই! জানালার কাচ দিয়ে দেখছি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরা। বাইরের সব কিছু দৃশ্যমান হলেও নিঃশব্দ, সেই শুরুর দিকের চলচ্চিত্রের মতো। এ ধরনের দেখার একটা সুবিধে যে ভাষার অজ্ঞতা কোন বাধা হয় না, তাই মনের

মতো করে তা উপভোগ করা যায়। তেলেঙ্গি তরুণ-তরুণীর হাবভাব দেখে অনুভব করা যায় তাদের প্রেম-সম্ভাষণ। তাদের দুর্বোধ্য ভাষার অনুবাদটুকু মনের রসায়ন করে নেয়, হাজার হোক, সবাই তো মানুষ!

এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি, গাড়ি এগোচ্ছে, ফেলে-আসা পথ দ্রুত অতীত হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমাদের পরিচিত ট্রেনের মতো এই গাড়ির আপ-ডাউন নেই, শুধুই আপ। এ যাত্রা vicarious বলে! গাড়ির গতিবেগও অত্যধিক, ঘণ্টায় হাজার মাইল! এ কালের হিসেবে ষোলো শ' কিলোমিটার। হঠাৎ একটা বন শুরু হল। বন, না মহাবনানী। কী ঘন গাছ! যেমন আকাশচুম্বী বনস্পতি, তেমনি নিচে জমির ওপর সুদীর্ঘ ঘাস আর আগাছার জঙ্গল। এ ভেদ করে যাওয়া মানুষ তো কোন ছার, জন্তু-জানোয়ারের পক্ষেও বোধ হয় অসম্ভব। কিন্তু ওটা কী দেখছি, সাপ না! কোথা দিয়ে সরু একটা রোদের শলাকায় তার পিঠটা চকচক করছে। সে কিলবিল করে এগিয়ে একটা খরগোশের পিঠে ছোবল মারল। মুহূর্ত মাত্র, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি প্রাণীটি লুটিয়ে পড়ল। আবার হঠাৎ শুরু হল ফুলের সমারোহ। এত বর্ণও আছে পৃথিবীতে! না-জানি তারা সুগন্ধি কি না, এ কামরায় তো গন্ধবহের প্রবেশাধিকার নেই!

কৌতূহল হল, ডানদিকে বসে তো যাচ্ছি, বাঁদিকে কী আছে! তাকালাম ওদিকে, দেখি, সেখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভূদৃশ্য। কেমন শান্ত গ্রাম, গতানুগতিক জীবনযাত্রা। অশ্বত্থের বাঁধানো বেদিতে বসে ক'-জন বৃদ্ধ হুঁকোতে তামাক খাচ্ছেন, গল্পগাছা করছেন। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। জায়া, কন্যা বা বধূ এসে প্রাতরাশ দিয়ে গেছে। শান্তি, পরম শান্তি, না উদ্বেগ, না আকাঙ্ক্ষা, না আক্রোশ। শুধু দু'-পায়ে হাঁটা, মুখে সীমিত শব্দের ভাষা। চাষবাস, পশুপালন, আর কী চাই! পশুর মতো জীবনযাত্রা, শুধু পশুর এক ধাপ ওপরে। আবার একটা ইংরেজি কথা মনে এল, vegetative living। নাঃ, এই ভাষাটাকে তাড়ানো গেল না। মনের এত রকম ভাব প্রকাশ করি আর কোন্ ভাষায়!

অবাক হয়ে ভাবি, এই যে সামান্য দূর দিয়ে এই ট্রেন চলেছে, তা ওরা অনুভবই করছে না, নাকি অনুভব না-করার ভান করছে। মনে পড়ে গেল আমার ট্রেন তো vicarious, কিন্তু ওরা যে বাস্তব! কী করেই বা অনুভব করবে! উঠে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে আমার সংরক্ষিত আসনে বসতে গিয়ে এই প্রথম আমার মুখোমুখি বসা সহযাত্রীর দিকে নজর গেল। এত ক্ষণ তাঁর দিকে তাকাবার সুযোগ হয়নি। কারণ একটা ছিল। সাধারণ ভাবে গেরুয়াধারীদের পছন্দ করতাম না, এক বিভিন্ন মিশনের সাধু ছাড়া। তবে মা বলে দিয়েছিলেন, কখনও কোন সাধুকে অসম্মান কোর না, প্রণাম না করতে পারো। তাই আমি আশ্রমের সাধু মনে হলে আর সে দিকে ঘেঁষি না। তির্যক দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়েছিলাম।

অবশ্য আমি ঘুম ভেঙে ওঠার আগে থেকেই তিনি ঐ একই ভাবে একটা বই পড়ছিলেন।

আমি এসে বসতে আমার দিকে বইটা মুড়ে তাকালেন, সহাস্যে বললেন, ইংরেজি ভাষা ছাড়া মনের সব ভাব প্রকাশ করা যায় না, তাই না? ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর নদী জপমালাধৃত প্রান্তর যে-চিত্র ব্যক্ত করে, তা আর কোন্ ভাষায় ফুটে ওঠে? আমার মনে পড়ে গেল মার্কিন মুলুকে ন্যাশনাল আর্চেস পার্কে গ্রেট আর্চের কথা। নব্বই মিটার উঁচু ঐ আর্চের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, সত্যই তা ধ্যান-গম্ভীর। অত পর্যটক, কিন্তু সবাই ফিসফাস করে কথা বলছে। এমনকী, পিছনের ঘন বনে আশ্রয় নেওয়া পাখিরাও চুপচাপ। তারাও স্থাণু এই শিলারাজের ধ্যান ভাঙাতে সাহস পায় না।

কিন্তু গৈরিক-পরিহিত ইনি আমার মনের কথা পড়লেন কী করে! জিজ্ঞেস করলাম, কী পড়ছিলেন? দেখালেন, *মহাভারতের কথা*। বুদ্ধদেব বসুর, না সুকুমার সেনের? বললাম, ও, মহাভারত! উনি বললেন, না, মহাভারতের কথা। মহাভারত লিখেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। বললাম, কেন! কাশীরাম দাসও তো মহাভারত লিখেছেন, লিখেছেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। তিনি হাসলেন, ওঁরা সবাই তো ব্যাস! ব্যাস মানে জানেন? যিনি বিস্তারণ করেন, আপনারা ছোটবেলায় যে ভাব সম্প্রসারণ করতেন বা ইংরেজিতে amplification করতেন, সেই রকম। তাই ব্যাস চিরঞ্জীব। ওঁরা যুগে-যুগে আসেন, শুধু মহাভারত নয়, হরিবংশ, ভাগবত, পুরাণ, সব কিছুর পুনরুদ্ধারের জন্য। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মহাভারত পড়েছেন?

এ আবার কী কথা! গেরুয়া ধারণ করে কি মাথা কিনে নিয়েছেন যে যা খুশি তা-ই বলবেন। বিরক্ত হয়ে বললাম, কত বার! স্মিতমুখে তিনি বলেন, সে তো পার্ট-টাইম পড়া! এ বার আমার অবাক হবার পালা। বললাম, মানে? তিনি বললেন, পার্ট-টাইম ছাড়া আবার কী! নইলে বড় অফিসার কেন ভুলে বসে থাকেন তিনি আলাদা প্রজাতির কোন প্রাণী নন, তিনিও মানুষ, এবং আর-পাঁচ জন মানুষের মতো আশা, আকাঙ্ক্ষা, রোগ, শোক, দুঃখ, সব সাংসারিক ব্যাধির শিকার। কারণ তাঁর অফিসারত্ব তাঁর দেহ, মন, সর্বসত্তা সর্বদা ঘিরে রেখেছে। তাই তাঁর অফিসারত্ব পার্ট-টাইম নয়, হোল-টাইম। আপনাকে কি মহাভারত সে ভাবে ঘিরে আছে? নেই! অথচ দেখুন, আপনিও মহাভারতের বাইরে নন, নিজেও মহাভারতের এক চরিত্র বা পার্শ্বচরিত্র!

আমার হতভম্ব ভাব দেখে বললেন, কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মহাভারত পড়া যায় না, সে তো সহজ পাঠ তৃতীয় ভাগ শেষ করে পড়ার মতো। কারণ আপনি, আমি,

আর ঐ যে আমাদের সহযাত্রীরা, সবাই মহাভারতের অঙ্গ, সবাই মহাভারতের চরিত্র। শুধু আমাদের দেশই নয়। সব দেশের সব কালের মানুষজন, পশুপাখি সবাই। সব্বাই।

এ যে একেবারে নতুন কথা শুনছি! কেউ তো আগে বলেনি। ওটা হজম হবার আগেই পুরনো কথার রেশ ধরে বললাম, মহাভারত তো সপ্তম শতকে লেখা! লিপি তখন এসে গেছে, পুঁথি রচনা হচ্ছে, তার ধারাবাহিকতা আছে। তবে আবার ব্যাসের দরকার কী ছিল?

স্বামীজি তার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনি তো জিওলজিস্ট! আপনিই বলুন না, মানুষ কবে মানুষ হল। একটু উল্লসিত হলাম। তার মানে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর তাঁর জানা নেই। তবে সেটা না খুঁচিয়ে বললাম, মানুষ এসেছে সাত হাজার বছর আগে, আবার কবে! উনি হাসলেন, তা হলে ল্যাস্‌ক আল্টামিরার ছবিগুলো কে আঁকল? সত্যজিৎ রায়ের *আগন্তুক* দেখেননি? সিনেমা দেখেন না? বাইসনের রক্তচক্ষুটা ভুলতে পারেন? সেগুলো তো যিশুরও ত্রিশ হাজার বছর আগের! সেগুলো কি বানরের আঁকা? জগদীশ বসু যেমন গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছেন বলে অনেকের, এমনকী উচ্চশিক্ষিত লোকেরও ধারণা। ডারউইনের বক্তব্যকে তরল করে *পাঞ্চ*-এ যে-ব্যঙ্গচিত্র বেরিয়েছিল ১৮৬০ সালে, তার খোঁয়ারি কিন্তু এখনও অনেক অধ্যাপকের মনেও থেকে গেছে।

আরে! ভদ্রলোক এত সব জানলেন কী করে। সত্য বটে, কিছু দিন আগে এক অধ্যাপকের লেখায় জগদীশ বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধে এমন এক কথা নাকি ছিল। তো, আমাকে ফোন করে সম্পাদক জানতে চাইলেন কথাটার সত্যতা। আমি লেখকের নাম জানতে চাইলে তিনি যখন তা বললেন, আমি বলেছিলাম, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন তো, তাঁর যে প্রাণ আছে, তা-ই বা আবিষ্কার করল কে। তারপর না-হয় গাছের প্রাণের কথা ভাবা যাবে! কিন্তু এই স্বামীজি তো জ্বালালেন দেখছি! তাঁর আকর্ষক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ যেন আটকে ধরেছে, ছাড়ানো যায় না। ওঁর স্মিত মুখমণ্ডল স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে উনি আমার সব চিন্তাতরঙ্গ ধরে ফেলছেন।

ক্রমে সাধু সম্বন্ধে আমার পোষিত সাধারণ ধারণা যেন ধসে পড়তে লাগল। স্পষ্ট হতে থাকল যে এঁর সঙ্গে কথা চালাতে গেলে সতর্ক থাকতে হবে। ওঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি। বললেন, আমি হমো সেপিয়েন্‌স-এর কথা বলছি। আপনি তো সবই জানেন! নিশ্চয়ই জানেন নিয়ান্ডারথাল, ক্রোম্যাগনন আলাদা-আলাদা নয়। সবাই হমো সেপিয়েন্‌স। তাদের আবির্ভাব দু'-লক্ষ বছরেরও বেশি আগে। পঙ্গাইডি নামে বানরের কোন জৈবিক খুল্লতাত থেকে তার আবির্ভাব, হাতে চার আঙুলের বিপরীতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের বিন্যাস নিয়ে। আপনারা তো বলেন বিপ্লব! এটা মেরুদণ্ডী

প্রাণীজগতে সর্বাধিক গুরুত্বের বিপ্লব। আগেই দু'-পায়ে সোজা দাঁড়ানোর ক্ষমতা এসেছিল। তা প্রায় পনেরো থেকে বারো লক্ষ বছর আগে। এ বার এই দুটো শারীরিক বিন্যাস দিয়ে শুরু হল মানুষের জয়যাত্রা। সে যাত্রায় আমরা এখন চলেছি।

অবশ্য সুসংবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত স্বরক্ষেপণ তার আগেই এসে গেছে। আর সে যুগে এক-দু' প্রজন্মে তো তা হয়নি, লেগেছে হাজার-হাজার বছর। কারণ প্রকৃতির কনিষ্ঠ সন্তানের লালনপালন তখনও মাতা প্রকৃতির হাতে। আমার মুখে বিরক্তির চিহ্ন সম্ভবত ফুটে থাকবে, কেননা সে দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ঐ আপনারা যাকে এভলিউশন বলেন। প্রকৃতির পরীক্ষাগারে প্রকৃতি মাতার পরীক্ষা-নিরীক্ষণের বিরাম নেই। কত প্রাণী কিছু দূর এগিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেকটা গর্ভপাতের মতো। ষাট বছর আগেও কেউ-কেউ মিসিং লিঙ্ক খুঁজেছেন। কিন্তু মিসিং লিঙ্ক কি থাকে! পরিণত হলে তা সেপিয়েন্‌স হয়, আর নইলে তার কোন চিহ্ন থাকে না। কই, এই বিজ্ঞানীরা তো কেউ মাছ থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি, পাখি থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যেকার মিসিং লিঙ্ক খুঁজতে বেরোননি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর ঋজু দেহভঙ্গি অন্য সব প্রাণীর উপর যে-সুবিধে দিয়েছিল, তা সহস্র গুণ বেড়ে গেল যখন সুসংবদ্ধ স্বরক্ষেপণ প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় রূপ নিল ইচ্ছামতো স্বরক্ষেপণের, স্বর নির্বাচনের। এল ভাষা। লিকিদের ধারণা, ভাষার প্রথম প্রকাশ লোককাহিনী রূপে। এক লক্ষ বছর এ জন্য ছেড়ে দিলেও পরের এক লক্ষ বছর মানুষ কী করল? নিশ্চয়ই নির্মনন বাঁচা নয়! কারণ ভাষা থেকে স্মৃতিতে উত্তরণ অবশ্য হাজার-হাজার বছরের ব্যাপার নয়। জীববিদরা জানেন জীবজগতের বিকাশ গুণোত্তর হারে। স্মৃতির সূত্রে বাঁধা পড়লে ব্যতিক্রমহীন ভাবে রোজ সকাল হয়, আবার সন্ধ্যাও হয়, নিয়মিত কালব্যবধানে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা আসে, আসে গাছে-গাছে আহার্যসম্ভারের উদ্গমের সময়। আর শুধু সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত নয়, তার আগে-পরে এই দুই আহ্নিক ঘটনার পর্যায়ক্রমিক প্রস্তুতি। রাতে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির ক্রমিক আবর্তন। বংশপরম্পরায় এ সব দর্শনলব্ধ জ্ঞান সঞ্চারিত হয়ে চলল উত্তর-পুরুষে ধারাবাহিক ভাবে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ এবং ঋতু পরিবর্তনের মতো আমার-আপনার কিংবা গাছের প্রাণ থাকা স্বয়ংসিদ্ধ বা অ্যক্সিয়ম, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই অ্যাক্সিয়মের পেছনে চরিত্র বা শক্তি, যা-ই বলুন, তা ঋগ্বেদের উপাস্য। তারাই দেবতা। আর তাই বেদও অপৌরুষেয়, গ্রন্থ নয়, শ্রুতি।

আমি মিনমিন করে প্রতিবাদের চেষ্টা করি, তার মানে ঋগ্বেদ এক লক্ষ বছরের পুরনো! স্বামীজি এ বার হাসলেন। বললেন, এই তো, আবার ভুল করলেন। ঋগ্বেদ কি একটা বই, পটলডাঙায় ছেপে বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিটে বিক্রি হবার মতো? আপনার তো উপনয়ন হয়েছিল, গায়ত্রী মন্ত্রের কথা ভাবুন না। এই ঋকের ঊষা দেবতা,

বিশ্বামিত্র ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি অর্থ করেছেন রচয়িতা। তার মানে মহা-প্রকৃতির এক রূপ বিশ্বামিত্রের কাছে এই ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। বিশ্বামিত্র এই রূপের দ্রষ্টা, তাই তিনি ঋষি। অবশ্য মনেয়ার উইলিয়ামস বলেছেন দৃচ্ থেকে ঋক্ কথাটি এসেছে। প্রতীয়মান হওয়া মনেয়ারের অর্থবোধের সমর্থক।

এ রকম সব ঋক্ ঋগ্বেদের দশটি অধ্যায় জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তবে হারিয়েও গেছে অনেক। কোন সময় কোন-কোনটি কোন ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। অনেকটা আপনাদের, ভূবিদদের বা নৃবিদদের ক্ষেত্রসমীক্ষার ফিল্ড নোটের মতো। আপনারা ক্যাম্পে ফিরে সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে আপনাদের প্রতিবেদন তৈরি করেন, তাই না? কিন্তু সে যুগে প্রতিবেদন লেখার কথা তো কেউ ভাবেনি, কারণ তার প্রয়োজনের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

আমার মুখ দেখে ওঁর মনে হল ওঁর যুক্তি আমার পছন্দ হচ্ছে না।

বললেন, আপনি ডাঙ্গের বইটার কথা ভাবুন, From Primitive Communism to Slavery। ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৪৯ সালে বেরিয়েছিল। তাতে তিনি একটা মডেল দিয়েছিলেন, কী ভাবে আদিম হমো সেপিয়েন্স যূথের মধ্য থেকে সভ্যতার, তথা জাতির উদ্ভব হল। তাঁর মডেল পরখী বা empirical। অনেকটা এ রকম : পরিবার বা যূথ (উত্তম পুরুষ) > অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সংঘর্ষ, পরে মিলন, তার ফলে মধ্যম পুরুষের আবির্ভাব > দুই পুরুষের ক্রমিক সমবায়নে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠীর উদ্ভব, সেই গোষ্ঠীই তখন উত্তম পুরুষ > দুটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর আকস্মিক সাক্ষাতে আবার সংঘর্ষ, ফলে দস্যুতা ও বর্বরতা, শেষে সমবায়নে উৎপত্তি আরও বৃহত্তর গোষ্ঠীর। উৎপত্তি ঘটল বৃহত্তর উত্তম পুরুষের > অনুরূপ ভাবে উৎপত্তি আরও বড় গোষ্ঠী বা উপজাতির, আরও বড় উত্তম পুরুষ রূপে > পরিবেশ অনুকূল অর্থাৎ শান্ত থাকলে কৃষ্টির বিকাশ > গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্যের বিলোপ > পরিবেশ অনুকূল অর্থাৎ শান্ত থাকলে সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি. . . এ পর্যন্ত বলে স্বামীজি চুপ করে গেলেন।

বললাম, তারপর?

উনি চিন্তিত মুখে বলেন, সেটাই তো প্রশ্ন! তারপর কী? মোক্ষলাভ, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, না দেবত্বে উত্তরণ? কার্ল স্যাগান যেমন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, আট কোটি বছর প্রাচীনত্বের সভ্যতায় সূর্যের মতো একটি জ্যোতিষ্কের শক্তি সম্পূর্ণ শোষণ করে মহাবিশ্বের অন্য কোন অঞ্চলে সেই শোষিত শক্তি পুনঃস্থাপিত করে নূতন এক সূর্যের সৃষ্টি করার ক্ষমতা আয়ত্ত হবে।

বলি, তা হলে দেবত্ব বলছেন কেন? ঈশ্বরত্ব বলুন। এই বার স্বামীজি উচ্চৈঃ-স্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, ঈশ্বর এমন সহস্র-সহস্র, কোটি-কোটি বা অসংখ্য

প্রক্রিয়ার কর্তা। তা ছাড়া ঈশ্বর অবাঙ্মনসোগোচর। ক্ষিধে পায়নি? সামনে খাবার আনছে, আসুন, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক!

বাইরে তাকানো হয়নি অনেকক্ষণ। সেখানে কখন সেই মহাবনানী মিলিয়ে গেছে। আসছে এক মহানগরী, তার অন্তেবাসী মানুষজনের বসতি শুরু হয়ে গেছে কখন, তা চোখেই পড়েনি। এমনই মজে গিয়েছিলাম স্বামীজির কথায়। আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, উনি হাত নেড়ে মানা করলেন। বললেন, বসুন। ওরা নিজেরাই খাবার নিয়ে আসবে। সত্যই তা-ই হল। স্বামীজি বললেন, আপনি ভুলে বসে আছেন যে আপনি কালবর্ত্মে চলছেন কালের রথে চেপে। এ পথে গাড়ি কোথাও থামে না, শুধু এগিয়েই চলে।

গ

খাওয়াদাওয়া সারা হল। মুখ ধুয়ে ফিরে দেখি, স্বামীজি চোখ বুজে জোড়াসনে বসে আছেন। অনেকক্ষণ একটানা কথার পর সম্ভবত বিশ্রাম নিচ্ছেন। কত ক্ষণ এ ভাবে কাটবে কে জানে!

তবে মিনিট-পাঁচেক পরেই তিনি চোখ খুললেন। বললেন, না! আমার ততটা ক্লান্ত লাগছে না; আপনার হয়তো লাগতে পারে। কী! আর-একটু বিশ্রাম নেবেন নাকি?

বলি, না, দরকার নেই। ঈশ্বরের কথায় আমরা বিরতি দিয়েছিলাম, এই ঈশ্বর কী? ভগবান, দেবতা, ঈশ্বর, সব কি একার্থক নয়? স্বামীজি বললেন, না, তা নয়। ভগবান হলেন মানুষ, যাঁর মধ্যে ষড়্ভগ বা ষড়ৈশ্বর্য বর্তমান। এই ষড়ৈশ্বর্য বলতে বলা হয়েছে ঐশ্বর্য, জ্ঞান, শ্রী, যশ, বৈরাগ্য ও ধর্ম। এই ঐশ্বর্য কী, অর্থ কি না, তা কোথাও স্পষ্ট বলা নেই, তবে আমার মনে হয়— *যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি/ তাহারি খানিক মাগি আমি নতশিরে। এত বলি নদীনীরে ফেলিল মানিক।*— সেই ধন। নেপলিয়ন হিল যাকে অন্তরের তৃপ্তি বলতে চেয়েছেন। তবে এই জ্ঞান পার্ট-টাইম জ্ঞান নয়, ব্যক্তিবিশেষের দেহ-মনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বুঝলেন! এই ওতপ্রোত কথাটির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। রাজা জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে মৈত্রেয়ীর শেষ প্রশ্ন ছিল— ব্রহ্ম কীসে ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান। তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, অতিপ্রশ্ন করিও না গার্গী, তোমার মুণ্ড খাসিয়া পড়িবে। পার্ট-টাইম প্রশ্নে অবশ্য মুণ্ড খসবে না, বলে মৃদু হাসলেন।

আমাদের আলাপচারিতার শুরুতে পার্ট-টাইম মহাভারত পড়ার কথা মনে পড়ল। ওঁর মুখের ভাবে তার সমর্থনও পেয়ে গেলাম। শ্রী না-হয় বোঝা গেল, কিন্তু যশ, তা কি আমাদের পরিচিত যশ? স্বামীজি বললেন, সঠিক প্রশ্ন ভেবেছেন। এই যশ

আদিগন্তবিস্তৃত ও কালজয়ী। তাই আমরা যাঁদের ভগবান বলি, তাঁদের বাইরে অনেক কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব রয়ে গেলেন, যাঁদের নামের আগে ভগবান কথাটি ব্যবহৃত হয় না।

বৈরাগ্য না-হয় বুঝলাম, কিন্তু ধর্ম? সেটা তো খুব গোলমালের বিষয়।

ধর্ম সম্বন্ধে আপনার ভাবনাটা আপনার নিজস্ব নয়। ওটা পার্ট-টাইম শিক্ষার অবদান।

ভাবি, আরে! এ তো মহামুশকিলে পড়া গেল, আমাদের সবই কি পার্ট-টাইম নাকি!

উনিই ব্যাখ্যা করলেন, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আমরা ধর্ম অর্থে ধরে নিয়েছি রিলিজিয়ন। তা নয়, রিলিজিয়ন ধর্মীয় আচার-আচরণ। ধর্ম, যা জাতিকে ধারণ করে, ইংরেজিতে যাকে বলে matrix, বাংলায় বলা চলে, ধাত্র। যা সমাজের পক্ষে, সভ্যতার পক্ষে শ্রেয়, তা-ই ধর্ম। পরিচ্ছন্নতা, পরিমিত আহার-নিদ্রা-মৈথুন, দয়া, করুণা, দাক্ষিণ্য, উপচিকীর্ষা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সদর্থক কাজ ও ভাবনা, এগুলি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, সমাজকে এগোতে সাহায্য করে। তাই এগুলি ধর্ম। এর বিপরীতগুলি অধর্ম। অধর্মের বৃদ্ধি ঘটলে আসে বর্বরতা। আর ধর্মীয় আচরণ বা রিলিজিয়ন হল অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ও বিবাহ। এগুলি নিঃস্বার্থ ভাবে করাই বিধেয়। কিন্তু এগুলিকে উপলক্ষ করে আবার অনেকে নিজের বিত্তবৈভব প্রদর্শন করতে চান। কিন্তু তা না-করে দরিদ্রকে দান, জনহিতকর দান ইত্যাদিতে সেই অর্থ ব্যয় করলে তা হয়ে যায় ধর্ম।

তবে ধর্মের আচরণের বাড়াবাড়ি ঘটলে তা আর ধর্ম থাকে না। জিজ্ঞেস করি, তা হলে কি অধর্ম হয়ে যায়? না। তখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। ব্যক্তির জীবনে এগুলি ধর্মের বিকৃতি, বা বিকার। বলি, এই যে পথে-ঘাটে দেখি অনেকে মন্দিরের পাশ দিয়ে গেলে কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে যেন দায় সারেন, সেটা কী? উনি বললেন, সেটা তো অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। এঁরাই মন্দিরে গিয়ে পয়সা খরচ করে কপালে সিঁদুর পরেন। অন্য লোককে ডেকে দেখানোর জন্য, দ্যাখ, আমি কতটা ধার্মিক। আরে বাবা! তোর ঘাড়ে কে দায় চাপিয়েছে বল তো, যে তোকে প্রতি পদে প্রতিপাদন করতে হবে তুই কতটা ধার্মিক। সারা দিনে নিত্য কাজে ধর্মের কোন পরিচয় নেই। নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করা ব্যক্তি সারা দিনে কত বার বাঁ-হাত প্রসারিত করেন, কত মিথ্যা বলেন, কত বার আমি শব্দটা ব্যবহার করেন, তার হিসেব নেই! যেন তিনিই সব কিছু করার পেছনে, তাঁর ওপরে আর কেউ নেই। এঁদের সাইন-বোর্ডে বেশি বিশ্বাস। কতটা জ্ঞান আছে, তা ছেড়ে এঁরা দাম দেন কতটা ডিগ্রি আছে, তার ওপর।

আর দেবতা? দেবতা, ভগবান আর ঈশ্বরের কথা যে হচ্ছিল, তা মনে করিয়ে দিই আমি। উনি বলেন, দৈবৎ কথা থেকে এসেছে দেবতা। যা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, ঝড়-ভূকম্প-ৎসুনামি, খরা-অতিবৃষ্টি-মহামারী, এগুলি এখনও মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যদিও আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, অমুক রোগের ওষুধ রেরিয়ে গেছে, তবু তা যখন মহামারীর আকার নেয়, তখন ভাগ্যই ভরসা।

ডাঙ্গের স্মৃতিচিত্রের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। গৈরিক বসনের অধিকারে তিনি তো অনেক কথাই বলে চলেছেন, তার কতটা যুক্তিসম্মত, তা-ও তো বুঝতে পারছি না। বললাম, আচ্ছা, ঐ যে যূথ থেকে গোষ্ঠীর উত্তরণের কথা বললেন, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে কি? উনি বলেন, মানে পাথুরে প্রমাণ বলছেন? বলি, ফসিল থেকে? হ্যাঁ, তবে তৃতীয় বা চতুর্থ ধাপ থেকে। তা এক-এক ভূখণ্ডে এক-এক প্রাচীনত্বের। সমবায়নের প্রাচীনতম জীবাশ্মভিত্তিক নিদর্শন পাওয়া গেছে রুমানিয়া, চেক গণতন্ত্র ও ফ্রান্সে। ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর প্রাচীনত্বের। ভারতে পাওয়া গেছে শুধু প্রাচীনতম হমো ইরেক্টাসের জীবাশ্ম। সেপিয়েন্‌সের এই অগ্রসূরি পনেরো থেকে বারো লক্ষ বছর প্রাচীনত্বের। তবে এরা সাধারণ ভাবে পশুর বহু ধাপ উপরে, কারণ এদের হাতে প্রথম নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। আর আগুন আসা মানে বুঝতে পারছেন? আপনারা আজকাল যাকে have and have-not বলেন, তাতে মানুষের বিভাজন শুরু। বুঝতেই পারছেন, সেই লড়াই আজও চলেছে, শুধু আগুনের বদলে এসেছে পারমাণবিক শক্তি, তাই না! লড়কে লেঙ্গে-র এই আবেগ, ক্রমশ আক্রোশ, ছলে-বলে-কৌশলে, এই তো আপনার বাস্তব ইতিহাসের নির্যাস।

ইরেক্টাসের পর ভারতে আর কোন মনুষ্যপ্রজাতির জীবাশ্ম মেলেনি? তা হলে কি এখানে ঐ গোষ্ঠী হারিয়ে গেল? স্বামীজি বলেন, হারিয়েও যেতে পারে, আবার এখানে এক স্বতন্ত্র ধারায় সেপিয়েন্‌সও এসে থাকতে পারে। তবে নিশ্চিত ভাবে বহিরাগত কোন সেপিয়েন্‌সের সঙ্গে মিলন যদি বা হয়েও থাকে, তবু তাদের সুস্থ সন্তান এসে থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য জীববিদ্যার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এ কথা বলছি। ডিএনএ পরীক্ষা করার মতো কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে দু'-হাজার দশের মার্চ মাসের *নেচার* পত্রিকায় দেখেছি রুশ দেশের এক গুহায় মানুষের হাড় পাওয়া গেছে, যার ডিএনএ এ যাবৎ পাওয়া কোন সেপিয়েন্‌সের ডিএনএ-র সঙ্গে মেলেনি। বিজ্ঞানীরা অনেকে ভাবছেন তা স্বতন্ত্র ধারার কোন মানুষের পূর্ব-পুরুষের হাড়। তেমন হওয়া সম্ভব ভারতেও। দাক্ষিণাত্যে বেশ ক'-টি গুহায় হাতি থেকে বহু প্রাণীর অস্থি পাওয়া গেছে, যার প্রাচীনত্ব আড়াই থেকে তিন লক্ষ বছর। দিদোয়ানা, ইয়েদুরোয়াদি— এ সব নাম শুনে থাকতে পারেন। এখানে মানুষের হাড় পাওয়া না-গেলেও মিলেছে পুরাপ্রস্তর যুগের অস্ত্র, যা প্রমাণ করে সেখানে মানুষের

পূর্বসূরির সঙ্গে শিকারজীবী ও শাকাহারী প্রাণীর সহাবস্থান, কোথাও আবার কাঠ-কয়লাও আছে। এ অনুমান সঠিক হলে সেপিয়েন্‌সের পূর্বপুরুষ অবাধে এই সব অঞ্চলে বিচরণ করত। দাক্ষিণাত্যের জলবায়ু বিগত দশ লক্ষ বছরে এমন কিছু বদলে যায়নি যে তারা সমূলে বিলুপ্ত হবে।

আমার খটকা লাগছেই! মুখে প্রশ্নটা এসে গেল, তা হলে আপনি কি বলতে চান যে সেই কালের স্মৃতিও সঞ্চারিত হয়েছে ভাষা সুসংবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। স্বামীজি বলেন, না! সুসংবদ্ধ ভাষা না এলে স্মৃতি থাকে না, বড়জোর দু'-চার দিন বা দু'-এক বছর থাকতে পারে, যেমন কুকুর, গরু, ঘোড়ার থাকে। তবে তা প্রজন্ম-পরম্পরায় সঞ্চারিত হবার মতো নয়। লিকির পুত্রের গবেষণায় যে চোয়ালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তার গঠন পরীক্ষা করে সুনিয়ন্ত্রিত স্বরক্ষেপণ ক্ষমতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এই ক্ষমতা থেকে উদ্ভব ভাষার। তারপর আসে স্মৃতি।

মহানগর অনেকক্ষণ পার হয়ে এসেছি। আমরা যেখান দিয়ে চলেছি, তার ডান দিকে অসংখ্য ধ্বংসস্তূপে ঢাকা সীমাহীন প্রান্তর। দেখলে শিউরে উঠতে হয়। চমকে বলি, আরে! এটা কী!

স্বামীজি বলেন, মন্বন্তরের চিহ্ন। মন্বন্তর মানে কি খাদ্যাভাব? স্বামীজি আমাকে দেখছিলেন, বললেন, একটা সভ্যতার বিলোপ। ইরাবতী কার্ভে যাকে বলেছেন যুগান্ত, অনেকে বলেছেন ক্রান্তিকাল।

আমি বলি, নতুন সভ্যতার শুরু? ওঁর ঠোঁটে সেই সস্মিত হাসি, বিলোপ হলেই কি শুরু হয়! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানির পুনর্গঠিত হতে ক'-দশক লেগেছিল? সেই কালের অন্তত হাজার গুণ সময় লেগেছে ঐ যুগে পুনর্গঠন শুরু হতে। তার একটা ধারণা পেতে পারেন হর্ষবর্ধন থেকে আকবরের মধ্যে কালের ব্যবধান থেকে। তবু হর্ষবর্ধনের কালে এসে গেছে অর্থশাস্ত্র, বেদাঙ্গের সব ক'-টি বিদ্যা, জীবকের মতো রসায়নবিদ, বরাহমিহিরের মতো সর্ববিদ্যাবিশারদ, যিনি বৃহৎ সংহিতার মতো কোষগ্রন্থ রচনা করেন, কালিদাসের মতো কবি, পতঞ্জলের মতো যোগশিক্ষক, পাণিনির মতো বৈয়াকরণ। তা-ও সভ্যতা থাকেনি, জড়, অর্থহীন গতানুগতিকতার শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের শাস্ত্রগুলি চলে গিয়েছিল তিব্বতে, দস্যুদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কত না রকমফের। কোথাও পড়োবাড়ির বসতি, কোথাও দগ্ধ বাড়িঘরের অবশেষ, আবার কোথাও দস্যুর হামলার নিদর্শন। আবার বালিমাটির আবরণে ঢাকা পড়ে যাওয়া বসতিও আছে। বাড়িগুলি অবশ্য এ যুগের বহুতল বাড়ি নয়, তবে হর্ম্য— শিলায় তৈরি। সভ্যতার উপাদানস্বরূপ যে-গোষ্ঠীগুলি ধীরে-ধীরে এক সুবৃহৎ উত্তম পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিল, তারা আবার পূর্বরূপ ধারণ করে

উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষে চলে যাচ্ছে! স্বামীজি বললেন, ব্যাপারটা কী জানেন? প্রকৃতিতে কারও, কোন কিছুর চুপচাপ বসে থাকার উপায় নেই। হয় এগোতে হবে, নয় পিছোতে হবে। ভাবি, জীবের ক্ষেত্রেও তো তাই-ই, পুরোমুখী না-হলে পশ্চাৎ-মুখী বিবর্তন। পশ্চাৎমুখী বিবর্তনে ডাইনোসর হয়েছিল প্রবল আর্থ্রাইটিসের শিকার, বিড়ালের মতো ছোট-ছোট স্তন্যপায়ী মাংসাশী প্রাণী তার দেহ খুবলে খেয়েছিল। বোধ হয় ট্রিনিদাদের পিচ হ্রদের একটি দৃশ্য বহু সংগ্রহশালায় প্রদর্শ। অবশ্য সেখানে ডাইনোসর নয়, আটকে গিয়েছিল হাতি ম্যাস্টোডন, আর তাকে যারা খাচ্ছিল, তারা আটকে-পড়া খড়্গদন্তী বিড়াল। বোধ হয় চোখ বুজে ভাবছিলাম। চোখ খুলতে স্বামীজি বললেন, পর্যালোচনা করছিলেন?

ঘ

আমার বৈচিত্র্যহীন কর্মজীবনে যে-সহকর্মীটি বিনা-কারণে সবাইকে উত্যক্ত করে বেড়াত, তাকে মাঝে-মাঝে দেখতাম চোখ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে। এ রকম একবার চোখ খুললে তাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, পর্যালোচনা করছিলাম। আমার মাধ্যমেই খবরটা ছড়িয়েছিল, ফলে সে পর্যালোচনা করতে বসলেই সবাই সতর্ক হয়ে যেত। তবে তাতেও শেষরক্ষা হত না।

স্বামীজি ঠিক ধরে ফেলেছেন আমার পর্যালোচনার তির্যক্ অনুভূতি। বললেন, মহাভারতে এ রকম পর্যালোচনা কে করত, বলুন তো। আমাকে নীরব দেখে বলে দিলেন, কৌরব-মাতুল শকুনি। পর্যালোচনা করে দুর্যোধনকে বুদ্ধি যোগাত। আজ-কাল এ ধরনের বুদ্ধি দেওয়াকে বলে মন্ত্রণা দেওয়া। এ রকম মন্ত্রণাদাতা ছিল কংসের, শিশুপালের।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম মহাভারতের কী হল, যা নিয়ে আমাদের পরিচয়, তথা আলাপ-আলোচনার শুরু। উনিও বোধ হয় বেশিক্ষণ ব্যাসের ভূমিকায় থাকতে চাইছিলেন না, নিজেই মহাভারতে ঢুকে গেলেন। বললেন, মহাভারত কার লেখা, মনে আছে? গণেশের! গণের রাজা, জনগণ, মানে গণস্মৃতি, ইংরেজিতে বলা চলে clan memory, ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা Dead Sea scroll প্রসঙ্গে যাকে বলেছেন Traditional Memory। ঋগ্বেদও এ রকম গণস্মৃতি, এক-এক ঋক্ এক-এক গণের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। কারও কাছে ঝড়বৃষ্টি (ইন্দ্র) রূপে, আবার কারও কাছে দাবানল (অগ্নি), কারও কাছে শৈত্যনিবারক (সূর্য) রূপে, দেহপোষক শস্য, ওষধি (নিরুক্তে যাকে বলা হয়েছে জীবনদায়ী) রূপে। সেগুলির সংকলন তো অনেক পরের। সংকলনের আগেই কত শ্লোক হারিয়ে গেছে, কত শব্দের অর্থ হারিয়ে গেছে, কারও বা অর্থ ধূসর হয়ে গেছে।

অর্থ আবার ধূসর হয়ে যায় নাকি? যায়। উনি উদাহরণ দেন 'গো' শব্দটির। শুধু গরু নয়, গো শব্দ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, বাক্, এগুলিরও বাচক। গোত্র শব্দটি তো এসেছে ভূমিকে ত্রাণ করা থেকে। এমন এক ভূমি, যেখানে কিছু কাল, কয়েক প্রজন্ম নিশ্চিন্তে বসবাস করা চলে। এ কালে মহাজন এরূপ এক শব্দ। মহৎ জন বোঝাতে শুরু হলেও আজ তা বোঝায় কুশীদজীবী। মূলে ঋক্‌গুলি যে-ভাষায় রচিত হয়েছিল, তা তো সব স্থানীয় ভাষা, প্রাকৃত। তার কোনটা হয়তো রুমানিয়ার হ্রদের ধারের ভাষা, কোনটা ইরানের, কোনটা আরবের, কোনটা আফগানিস্তানের। এমনকী, মিশরের ভাষাও আছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পাণিনির প্রয়াসে সবে সংস্কৃত ভাষা রূপ পাচ্ছে। তাঁর কিছু আগে যাস্ক। তিনি চেষ্টা করে চলেছেন আদি বৈদিক ভাষা পুনরুদ্ধার করতে। কোন কালে দ্রাবিড়দের একটি গোষ্ঠী এসে বসবাস শুরু করেছিল কাশ্মীরের উত্তরে। তাদের ভাষা ব্রহুই, তার থেকে অনেক শব্দ এসেছে বালুচ ভাষায়, এমনকী কুর্দিশ ভাষায়। দ্রাবিড়দের সঙ্গে এ ভাবেই জড়িয়ে আছে, আমরা আজ যাদের জনজাতি বলে থাকি, তাদের ভাষা। শবর, চেঞ্চু, গোণ্ড, মারিয়া ইত্যাদি। যাঁরা জনজাতি বলেন, তাঁরা জানেন না এরা উঠতি গোষ্ঠী নয়, এরা ক্ষীয়মান উন্নত গোষ্ঠীর উত্তরসূরি। এ সব ভাষার বহু শব্দ ঢুকে আছে সংস্কৃত ভাষার অনেক মন্ত্রে।

বলি, তা হলে আর্যদের ভাষা সংস্কৃত নয়? উনি চুপ করে থাকলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, ইংরেজদের শেখানো ভূত ঘাড় থেকে নামা মুশকিল। এই সেদিন, আপনার মতো এক ভূবিদ, যিনি মুখে বলেন তিনি ইজিপ্টোলজিস্টও বটেন, বলছিলেন আর্যরা যখন এসে মোহেঞ্জোদারোর লোকজনদের মেরে-ধরে তাড়িয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করল. . .। আচ্ছা, আমাকে বলুন তো, ইংরেজরা তো ভারতে এসেছিল এখানকার সম্পদের কথা শুনে, কিন্তু তিন হাজার বছর আগে (পার্জিটারের হিসেবে) তারা হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ থেকে মোহেঞ্জোদারোর খবরটা পেল কোন্ রয়টার কিংবা এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে। আর চারটে দুর্গম পর্বতশ্রেণী পার হয়ে সিংহ ও আরও নানান হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ভূভাগ এড়িয়ে সেখানে এসে হাজির হল কী করে! চার শ' বছর আগে সাইবেরিয়া বাদ দিলে ইয়োরোপের জনসংখ্যা ছিল চার কোটি। দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লাখের কিছু বেশি, সেখানে পার্জিটারের মডেল কতটা গ্রহণযোগ্য?

তার বদলে যদি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রস্তাবটা ভাবি, তবে অনেক বেশি গ্রহণ-যোগ্য মনে হবে।

তিনি পুরাপ্রস্তর যুগের যে-স্তরটিতে এসেছে শিকার করে মাংস আহরণ, গাছের ফলমূল থেকেও আহার্য আহরণ, যে-স্তর থেকে এসেছে আগুন ইচ্ছামতো প্রজ্বালন

ও আগুনের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা, কোথাও বার হয়েছে চাকার তত্ত্ব অর্থাৎ ভারি বস্তু গড়িয়ে নিয়ে যাবার সহজ পদ্ধতি, তার নাম দিয়েছেন শবর।

এই শবর স্তরটি কালের মেয়াদে এবং জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড়। এই স্তরে হমো ইরেক্টাস থেকে ধাপে-ধাপে আবির্ভাব উন্নততর মানুষের। প্রাচীনতম ধাপ হমো আন্টেসেসর, বারো থেকে আট লক্ষ বছর প্রাচীনত্বের। টোমোগ্রাফি পদ্ধতিতে জানা গেছে তারা প্রধানত ডান হাতে কাজ করত। এরা আমাদের মতোই গড়ে সাড়ে-পাঁচ থেকে ছ' ফুট দীর্ঘ, পুরুষরা ওজনে নব্বই কেজি। পাথরের অস্ত্র পাওয়া গেছে এদের দেহাবশেষের সঙ্গে। এই স্তরে ছ' লক্ষ থেকে চার লক্ষ বছর প্রাচীনত্বের মধ্যে রাজত্ব হমো হাইডেলবার্গেনসিসের। এরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করত শুধু নয়, সমাধির মধ্যে দানসামগ্রী সাজিয়ে দিত, যা কয়েক লক্ষ বছর পরের পিরামিডের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

তবে শবরদের সভ্যতা ছিল, না শুধুই কৃষ্টি ছিল, তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা যতই তর্ক করুন, এটা না-মেনে উপায় নেই যে, তারা অন্তর্কলহে আত্মহনন থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বোধ হয় প্রকৃতিরই দাক্ষিণ্যে তারা নিজের-নিজের দলকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট। তাদের কানের গঠন থেকে অনুমিত হয়েছে যে, তারা নিজেদের দলের সদস্যদের স্বর চিনতে পারত। তবে এই দলটা কি পরিবার, না বহু পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী, তা জানা যায়নি। ডাঙ্গের সৃতিচিত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপে হতে পারে এদের আবির্ভাব। এরা থাকত পর্বতগুহায়।

এদেরই মিলিত নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন ভাবে এক-এক জায়গায় এক-এক সময়ে এসেছে মধ্য-প্রস্তর যুগ। এই মধ্য-প্রস্তর যুগের এক-এক সময়ে এক-এক ভূভাগে দ্রাবিড় কৃষ্টির উদ্ভব। গোষ্ঠী যখন অনেক বড় হয়ে যায়, তাদের স্থায়ী বাসভূমিও জুটে যায়, তখন আবির্ভাব হয় সভ্যতার। দুটি স্বতন্ত্র ভূভাগে গাছপালা, পশুপাখি, আহার্য ও জলবায়ুও স্বতন্ত্র। তাই সভ্যতার ধাঁচও স্বতন্ত্র। কালে ভাষাতেও তার প্রতিফলন হল। কালের এই অন্তিম পর্যায়ে এসে গেছে আগে যাদের নিয়ান্ডারথাল বলা হত, এখন সেপিয়েন্‌সের মধ্যে ফেলা হয়, তারা। মধ্য-প্রস্তর যুগের শেষে এই সব মানুষের প্রধান আশ্রয় গুহা হলেও এদের কোন-কোন দল সমতলভূমিতে বেরিয়ে শিলাখণ্ড সাজিয়ে আবাস বানাতে প্রয়াসী। আবার কেউ শুকনো ঘাসপাতা দিয়ে ছাউনি বানিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করেছে, এমনও দেখা গেছে। কিন্তু এরা সমষ্টিগত ভাবে কোন্ পর্যায়ের, তা বোধ হয় জানা যাবে না কোন দিনই। তারা তো আর জানত না আমরা তাদের লক্ষ প্রজন্ম পরে তাদের জীবনধারা সম্বন্ধে এতটা কৌতূহলী হব! তবে ঋগ্বেদের কোন-কোন ঋক্ এ সম্বন্ধে কিছু-কিছু ইঙ্গিত দেয়।

এই দ্রাবিড় সভ্যতা সাধারণ ভাবে স্থাবর সভ্যতা। পাশাপাশি এক যাযাবর সভ্যতা

গড়ে উঠছিল আফ্রিকায়, নিরক্ষরেখার উত্তরে। এদের সভ্যতায় ভাষাই প্রধান অবলম্বন। তাকে অবলম্বন করে সঙ্গীত, স্তোত্র, প্রার্থনা, যজ্ঞ ইত্যাদির আবির্ভাব। এটাই আর্য সভ্যতা। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে সাধারণ ভাবে যাযাবরত্ব নেই। ভারত নিরক্ষরেখার অনেকটা উত্তরে হলেও বিন্ধ্য-সাতপুরা গিরিমালার দক্ষিণে স্থাবরত্বই প্রধান। ওদিকে আফ্রিকাতেও নেই। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে যাযাবরত্ব খুব কম, ছোট-ছোট গোষ্ঠীতে থাকলেও জনজাতিতে নেই। কারণ এ সব জায়গায় সমতল প্রান্তরে পর্যাপ্ত খাদ্য, জলবায়ুর মারাত্মক হেরফের কম। কিন্তু নিরক্ষরেখার উত্তরে সমভূমি কম, বন্ধুর ভূমি বেশি। সেখানে আবহাওয়ার হেরফের নিত্য ঘটনা। দু'-চার প্রজন্ম পরপরই পাততাড়ি গুটিয়ে নূতন বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া।

এই প্রব্রজনও আবার সর্বত্র এক কালে নয়। এ যুগের অভিযোজনের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তিব্বতের মালভূমি, ক্যাস্পিয়ানের উপকূল, আরবের বালুচিস্তানের মরুভূমি তখন তৃণভূমিতে শ্যামল। ভারতেও হিমালয়ের দক্ষিণদেশ তখন বনভূমি আর সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকা, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় তখন বসবাসের যোগ্য তৃণভূমি। এখানে এই যাযাবরদের বাসস্থান গড়ে উঠল বহু প্রজন্মের জন্য। তবে দাক্ষিণাত্যের বনাঞ্চলের পশ্চিমে দীর্ঘ তটভূমি তখন বাসযোগ্য, কৃষ্ণমৃত্তিকার প্রভাবে অতি উর্বর। এখানে মূল দ্রাবিড় সভ্যতা নিত্য রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। পূর্ব উপকূলের তটভূমি অতটা অবিচ্ছিন্ন নয়। তবু এখানেও মূল দ্রাবিড় সভ্যতার রূপান্তর ঘটছে।

তা হলে কি দ্রাবিড় সভ্যতা নিরক্ষরেখার উত্তরে কোথাও ছিল না? মানে, তার উদ্ভব হয়নি? স্বামীজি বললেন, তা কেন হবে! শবরদের দিয়ে যদি সভ্যতার শুরু হয়ে থাকে পৃথিবীর সর্বত্র, তবে দ্রাবিড় সভ্যতাও বহু স্থানে এসে থাকতেই পারে। উত্তর আফ্রিকায় বহু সমতলভূমি তো ছিলই। আড়াই লাখ বছর আগে সে সবের অনেক জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী বসবাসের মতো আবহাওয়া এসেও গিয়েছিল। মিশর, তার পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল সমভূমি। উত্তর আফ্রিকার অনেকটা অঞ্চলই উচ্চতায় পাঁচ শ' মিটারের নিচে। বাদ পূর্বে ইথিওপিয়া আর উত্তর-পশ্চিমে আটলাস পর্বতমালা। সাহারা মরুর অনেকটা জায়গাই প্রায় সমভূমি। আজ মরুভূমি হলেও সে সব জায়গায় তখন পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত। মরুভূমির বদলে সেখানে ঘন বনাঞ্চল দাক্ষিণাত্যের মতো। সেখানে স্থাবর শবর সভ্যতা দ্রাবিড় স্তরে উন্নীত হয়ে থাকতে পারে। বারো হাজার বছর আগে যখন তুষার যুগ শেষ হতে শুরু করল, শুধু তখনই তাদের স্থান ত্যাগের প্রশ্ন এল, তা-ও রাতারাতি নয়, বহু প্রজন্ম ধরে। তাদেরও সঙ্গীত ছিল, কিন্তু চরৈবেতি চরৈবেতি না-থাকার জন্য কৃষ্টির বৈচিত্র্য আর্য স্তরের মতো উন্নত হয়নি। আবার শবরের পরবর্তী ধাপের সবে উন্মেষ ঘটছে, এমন কোন ধাপে তারা পৌঁছেছিল। ওদিকে হিমালয় পার হয়ে যত গোষ্ঠী এসেছিল, তাদেরও সবাই কি

একই পর্যায়ে পৌঁছেছিল? তা-ও নয়। আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার ফল সামান্যীকরণ। একটা দ্বৈপায়ন সভ্যতার হাত ধরে আমাদের আধুনিক চিন্তাভাবনার বিকাশ তো! তাই সামান্যীকরণ করতে আমরা ভালোবাসি।

কিন্তু দু' হাজার বছর আগের গ্রিক অনুপ্রবেশের কথা ভাবুন। গ্রিসে অনেক দ্বীপ থাকলেও, তাদের শবর সভ্যতা থাকলেও টানা সমভূমির তুলনায় তাদের জঙ্গমতা বেশি। তারা দ্রাবিড় সভ্যতার তুঙ্গে পৌঁছে ভারতের আর্য সভ্যতার মুখোমুখি হয়েছিল। তারা ডাঙ্গের সৃতিচিত্রের পঞ্চম বা ষষ্ঠ পর্যায়ে উঠে ভারতে এসেছিল। চাণক্য আর অ্যারিস্টটলের রচনার সাদৃশ্য, পতঞ্জল আর পিথাগোরাসের মতবাদের সাদৃশ্য কি কাকতালীয়, না একই গুরুর হাতে সন্দীপন? সক্রেটিসের মতবাদের এক অংশ তো ভারতের লোকায়ত দর্শনের অনুরূপ, যে-লোকায়তে আদিগুরু বৃহস্পতি, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি সত্যকাম জাবাল। আর মহাদেবের কথাই ভাবুন না! তিনি তো আর্য স্তরের নন, দ্রাবিড় সভ্যতার প্রতিভূ। আমার তো মনে হয়, আটলান্টিস খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার অস্তিত্ব সত্য। পোসাইডনের ট্রাইডেন্ট শিবের ত্রিশূল, ক্রিট দ্বীপে নসসের মিনোটর শিবের নন্দী!

স্বামীজি টানা বলে চলেছেন। হঠাৎ বাঁদিকে তাকিয়ে বললেন, ওদিকটা দেখেছেন?

ঙ

বাঁদিকে তাকিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া। কোথায় গেল সেই নিম্নমধ্যবিত্ত ধারাবাহিকতা, গাড়ির মধ্যে সংসার পেতে গতানুগতিক কালক্ষয় কই! তারা গেল কোথায়, গেলই বা কখন! গাড়ি তো থামেনি কোথাও! আর কালবর্ত্মে কি কালের রথ থামে! অথচ সে জায়গায় এখন দেখছি তাসের জুয়ার ছড়াছড়ি। কী করে!

স্বামীজি আমাকে তাঁর তীব্র দৃষ্টি মেলে দেখছিলেন। বললেন, ওদেরও বিবর্তন হয়েছে যে! ওরা মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে উঠেছে। অর্থ ওদের এত, বিত্ত এত অনায়াসলভ্য যে তা খরচ করার সুযোগ নেই। তাই বসে গেছে জুয়া খেলতে, অবশ্য তাসের জুয়া। কারণ কালহরণ ওদের কাছে একটা সমস্যা। এই অপচয়ের পদ্ধতির মধ্যে পড়ে অসংখ্য কাজ, যা অন্ধ তামস জগতের অবলম্বন। সমাজবিরোধী সব ক্রিয়াই এদের কাজ! অক্ষক্রীড়া ঋগ্বেদের অক্ষসূক্তের বিষয়বস্তু। মহাভারতের পাশা খেলার কথা মনে পড়ে? সেখানে অক্ষক্রীড়া তো হোলটাইম। আর্য সভ্যতার যখন আর কিছু করার নেই, সম্পন্ন করার মতো কোন কাজ নেই, সভ্যতা লক্ষ্যভ্রষ্ট, তখন এল ব্যসন। ক্যানসারের মতো এমন এক রোগ, যা পুরো সমাজকে অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যায়। আমার মনে খটকা লাগে। সমাজ কেন, সভ্যতারও তো অবক্ষয়

হবার কথা। স্বামীজি বললেন, তা-ও বলতে পারেন। তবে ভারতের মতো বড় ভূভাগে তা হওয়া প্রায় অসম্ভব। ধানে এক জায়গায় পোকা লাগলে যেমন অন্য প্রান্ত থেকে নীরোগ ধানের জিন এনে সংক্রমণ রোধ করে সেই রোগাক্রান্ত ধানকে স্বাভাবিক করা যায়, তেমনি সভ্যতারও হাল ধরে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু গ্রিসে সভ্যতারই অবক্ষয় ঘটেছে, ঘটেছে আরব্য উপদ্বীপেও।

তা হলে তো সব কিছু হারিয়ে যাবার কথা! আমি সভয়ে বলি। স্বামীজি বলেন, হারিয়ে তো গেছেই আগের-আগের যুগে। তবে এ যুগে তা আর সম্ভব না। আগে হয়েছে, কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে তো কিছু ছিল না সে যুগে! আমার মুখে প্রশ্ন এল, তা-ই যদি হয়, তা হলে বেদ-মহাভারত সব স্মৃতিসূত্রে পরিবাহিত হল কী করে। তবে আমাকে বলতে হল না। তিনিই বললেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের কথা নিয়ে তো প্রচুর গোলমাল। এগুলোর অর্থ জনেন? ভেবে দেখলাম, মাথা নেড়ে না বলাই ভালো, উনি কী বলেন দেখাই যাক না!

এ ভদ্রলোক তো প্রথম থেকেই আমার মনের কথা মুখে আসার আগেই পড়ে নিচ্ছেন। বললেন, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম অমরসিংহের *অমরকোষ* গ্রন্থ অনুযায়ী সব শূদ্রই বেতনভুক কর্মচারী। সে দিক থেকে গৃহভৃত্য যেমন, তেমনি সরকারি-বেসরকারি আধিকারিক, বেতনভুক শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, পরামর্শ-দাতা, শিল্পী— এঁরাও শূদ্র, শূদ্র সেনাপতিও, কারণ তিনিও বেতনভুক। অর্থাৎ সমাজের অবশ্যকরণীয় কাজগুলি যাঁরা অর্থের বিনিময়ে করেন, তাঁরা সবাই শূদ্র। তেমনি যাঁরা সম্পদকে বিত্ত ও অর্থে রূপান্তরিত করেন, তাঁরা বৈশ্য। তাঁরা সমাজের সব ধরনের শূদ্রের শ্রমের বিনিময়ে অর্থ ও বিত্ত অর্জন করে থাকেন, তবে এ জন্য তাঁদের যে-শ্রম খরচ করতে হয়, সে জন্য সমাজ তাঁদের আলাদা করে অর্থ দেয় না। ক্ষত্রিয়ের কাজ সমাজকে রক্ষা করে শূদ্র ও বৈশ্যের কর্মসম্পাদন বিঘ্নহীন করা। এখান থেকে আসেন রাজা, জমিদার, দলপতি। ব্রাহ্মণ সমাজের পরামর্শদাতা, সবার পরামর্শদাতা, সমাজের ও দেশের নীতিনির্ধারক। তাই তিনি সমাজের মাথা। কিন্তু তিনিও ক্ষত্রিয়ের রক্ষণীয়। এটাই হল চতুর্বর্ণের ভিত্তি।

তবে যারা অক্ষক্রীড়া করত, বা ওপাশে যারা তাস খেলে কাল কাটাচ্ছে, তারা কোন্ শ্রেণীভুক্ত?

তারা এদের কোন শ্রেণীভুক্তই নয়, তারা সংকর। বর্ণসংকর। উচ্চপদস্থ শূদ্র বৈশ্যের প্রভাবে রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় বিত্ত ও অর্থে সমাজের কেন্দ্রকে কুক্ষিগত করলে হয়ে যায় বর্ণসংকর। সমাজের স্থায়িত্ব বাহিরের দিক থেকে তখন ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকে। পাশের অন্য এক সমাজের প্রভাব তখন সেখানে বিস্তারলাভ করে। এই প্রভাবের ফল ভালো-মন্দ, দুই-ই আছে। ব্রিটিশ আমলে যেমন সাহিত্য, শিল্প,

তেমনি আচার-ব্যবহার, সবই এ ভাবে ঢুকে পড়ে আমাদের সমাজকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি কলুষিতও করেছে। স্বল্প কিছু মানুষ, যাঁরা বৃত্তিগত ভাবে ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাঁরা সমৃদ্ধ হলেন ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যায়, তেমনি সাধারণ মানুষের অনেকে কিন্তু খারাপ দিকটাই নিল— মদ্যপান, বৃথা গর্ব, বৈভব প্রদর্শন, আত্মরতি, দম্ভ, পোশাক ও শেষে ধর্মীয় আচরণের, স্বকীয় সংস্কৃতির তথা সভ্যতার প্রতি অশ্রদ্ধা। সার্বিক ভাবে সমাজের বিকাশ প্রতিহত, কখনও রুদ্ধ হতে চলল। আজ কেন্দ্রকে ব্রিটিশ না-থাকলে কী হবে, আছে ক্ষাত্র-বৈশ্য, ক্ষাত্র-শূদ্র, ক্ষাত্র-ব্রাহ্মণ বা বিপরীত সংকর, যেমন বৈশ্য-ক্ষাত্র, শূদ্র-ক্ষাত্র বা ব্রাহ্মণ-ক্ষাত্র সংকর। এরা সমাজে সাধারণ ভাবে অভিজাত নামে পরিচিত। আভিজাত্য একটি আরোপিত গুণ। তা সদর্থক হলে হয়ে যায় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এক দুর্দমনীয় শক্তি। কিন্তু তা না-হলে হয়ে দাঁড়ায় এক আত্মকেন্দ্রিক স্ব-সর্বস্ব বাধা, যা সমাজকে গণ্ডিবদ্ধতার শিকারে পরিণত করে। অধ্যাপক তখন তাঁর মতাবলম্বী না-হলে কোন ছাত্রকে পথে বসান, প্রশাসনে কোন ব্যক্তি-শত্রুকে উপলক্ষ করে বিরোধী পক্ষের প্রত্যক্ষ সমালোচক হয়ে পড়েন কোন মন্ত্রী।

তবে সর্ব ক্ষেত্রে কেন্দ্রক থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, মানুষের ততই দুর্গতি। এই দুর্গতির পরিণাম অবশ্য মহাভারতের কালে এসেছিল মন্বন্তর রূপে, তার পূর্ববর্তী কালগুলিতেও মন্বন্তর রূপেই। ডান দিকে দেখুন এ বার।

ডান দিকের জানালা দিয়ে দেখি, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে মাছির মতো মানুষ, তাদের আকৃতি-আচার-পোশাকে বোঝার উপায় নেই তারা কে কোন্ স্তরে ছিল সমাজ বা সভ্যতা ধ্বংস হবার আগে, দলে-দলে চলেছে। মাঝে-মাঝে ব্রাহ্মণকে চিনতে পারি মলিন জীর্ণপ্রায় উপবীত দিয়ে, কিংবা ক্ষত্রিয়ের উত্তরপুরুষকে মরচে-পড়া তলোয়ার দেখে। ভিক্ষাবৃত্তি থেকে জুতো সেলাই— কোন কাজেই তাদের আপত্তি নেই। উঠে আসছে নিম্নমেধার মানুষজন ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সমীকরণ হয়ে গিয়েছিল জন্মসূত্রের সঙ্গে অবক্ষয়ের শুরুতেই। তাদের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ, কারণ একদিকে আভিজাত্যের অহঙ্কার, অন্য দিকে বৃত্তিগত পেশায় উপার্জনের সুযোগের অভাব। যদিও দিন কাটে অর্ধাশন ও অনশনে, তবু জন্মের অহঙ্কার যায় না।

এরা প্রথমে সংকর, তারপর ক্রমে হয়ে যায় ভিন্ন ধর্মীয় আচারের শিকার। তাদের প্রধান লক্ষ্য কেন্দ্রকের ধর্মকে প্রতিহত করা। মহাভারতের যুগে এরা হয়ে গেল অনাচারী, ক্রমে ম্লেচ্ছ, পরে স্বেচ্ছাচারী, শেষে দস্যু। কালবর্ত্মের বাঁ-দিকে যে-শান্ত আকাঙ্ক্ষাহীন পরিতৃপ্ত পরিবারগুলি দেখেছিলেন, তারা হয়ে গেল এই স্বেচ্ছা-চারীদের শিকার। এল, আজ আমরা যাদের জনজাতি বলি, সেই ক্ষীয়মান সভ্যতার

উত্তরপুরুষ। এদের অনেকগুলির মধ্যে কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বর্ণগুলি আছে। যেমন মুণ্ডা, গোণ্ড, কোল, ভিল। এদের অনেকের মধ্যেই থেকে গেছে বর্ণের রেশ। যেমন গোণ্ডদের মধ্যে আছে মারিয়া, মুরিয়া আর ডোরিয়া। তারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য। ভিলরা আবার গোণ্ডদের ক্ষীয়মান অংশ। তাদের ব্রাহ্মণ হল বাইগা। এই মন্বন্তরের কালেই ধর্ম আর রিলিজিয়নের সমীকরণ হয়ে স্বীকৃত হল ধর্ম রূপে। আর সেই ধর্ম হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় পণ্য। এ দেশে বা পাশ্চাত্যে কোন তীর্থক্ষেত্রে গেলেই তার প্রমাণ পাবেন।

মহাভারতে কি এমন বর্ণসংকর ছিল না? কেন থাকবে না! সর্বকালেই সভ্যতার ধ্বংস আসন্ন হলে সংকরের আবির্ভাব ঘটে। ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হয়েও কৌরবদের অন্নদাস, অর্থাৎ শূদ্র, দ্রোণ ব্রাহ্মণ হলেও একই কারণে শূদ্র। আবার একলব্য ব্যাধ, শবর। তার তো কোন বৃত্তিগত বর্ণ ছিল না। তবু কর্মযোগে সে সাধনকালে ব্রাহ্মণ, আর যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়। যেহেতু সংকর কথাটা নিন্দার্হ, তাই একলব্য সংকর নন। আর স্বেচ্ছাচারী কারা? স্বামীজি বলেন, স্বেচ্ছাচারীর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণের যদুকুল। তবু কুরুবংশে পরীক্ষিৎ থেকে গেলেন, কিন্তু যদুবংশে কেউ রইল না। আর পাণ্ডবদের কী হল? স্বামীজি একবার আমাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করে বললেন, ভাবতে পারেন, অর্জুনের পৌত্র, যার পিতামহী শাকান্ন পর্যন্ত তুলে দেন অতিথির পাতে, সেই পরীক্ষিৎ ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিল সাপের মৃতদেহ! এই কুকর্ম, ইংরেজিতে যাকে বলে delinquency, তার দ্বিতীয় উদাহরণ দেখাতে পারেন গত চার দশকের আগে?

ভাবছিলাম। মহাভারতে তা হলে যুদ্ধটা কী। আমার সহযাত্রী বললেন, বুঝতেই পারছেন, অন্তত বিশ্বযুদ্ধ বা তার ধারে-কাছের কোন সংঘর্ষ নয়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, আপনি পিটার ব্রুক-এর মহাভারত ছবিটা দেখেছেন? সম্মতিসূচক মস্তক-আন্দোলনে বলেন, ওটাতে যে-গোষ্ঠী সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে, আমার তো মনে হয় তা-ই। সেটা ডাঙ্গের সৃতিচিত্রের আট পর্যায়ের পরে, যেখানে আমরা এসে থমকে দাঁড়ালাম, মোক্ষ না কী, স্থির করতে না-পেরে।

কিন্তু এই যুদ্ধটা কেন?

পোলারাইজেশন জানেন? সমবর্তন। একটি মাত্র তলে তরঙ্গের আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে গেলে সমবর্তন ঘটে। এখনকার ভাষায় বলে, মেরুকরণ। সভ্যতার বা জাতির যে-কেন্দ্রকে বিত্ত গিয়ে জমে, সেখানে যে-ই থাকুক, তাদের ভাষা, ব্যবহার, জীবনদর্শন, সব এক রকম হয়ে যায়। কথায় বলে, 'সব শেয়ালের এক রা'। কুরু কথাটার অর্থ, কাজ করো। কী কাজ? বিভিন্ন বৃত্তির উপযুক্ত কাজ। কিন্তু সেই কাজ পর্যবসিত হয়েছে অক্ষক্রীড়ার প্রতীকে নানান অকাজে। সেটা নঞর্থক মেরু, কারণ

বিত্তসম্পদ সব সেখানে এসে আটকে যাচ্ছে, তার কোন সদ্ব্যবহার নেই। আর যারা সেই সম্পদ তৈরি করছে জমি চাষ করে, খনি থেকে মণিক তুলে, এ সব কাজের জন্য মানুষকে বেতনভুক বিভিন্ন কাজের উপযোগী তৈরি করে, ক্ষত্রিয়কে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে, ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রে পারদর্শী করে, তারা সদর্থক বা positive মেরুর উপাদান। এই দুই মেরুর মধ্যে যোগাযোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে কি তড়িৎ উৎপন্ন হবে? এখানে তড়িৎ মানে সভ্যতার অগ্রগতির শক্তি। আপনার পদার্থবিদ্যা কী বলে?

বলি, আপনার মুখে যেন কর্মসংস্কৃতির কথা শুনছি! অবশ্য কর্মসংস্কৃতি চলে গেলে সভ্যতা দাঁড়ায় কোথায়!

উনি বললেন, ঠিকই শুনছেন। পাণ্ডবরা কৌরবদেরই শাখা, অভিযোজনের পথে বিভিন্ন ভূমিতে থেকে গিয়েছিল। এ রকম পাঁচটি উন্নত গোষ্ঠী পঞ্চজন। পরে আব-হাওয়ার পরিবর্তনে তারা যখন উদ্বাস্তু হয়ে পড়ল, তখন তাদের প্রথম নজর পড়ল উত্তরভারতের ওপর। সেটাই তো স্বাভাবিক! কারণ সেখানে অতি উন্নত মানের সভ্যতা বহু কাল ধরে বিরাজমান। পাকিস্তান হবার পর ওপার বাংলা থেকে দলে-দলে যে-সব উদ্বাস্তু এসেছিল, তারা কি এপারে এসে তাদের পরিচিত বা আত্মীয়-জনের আশ্রয়ে থাকার চেষ্টা করেনি? শ্রীকৃষ্ণ এই পাঁচ শাখার কেউ না-হলেও এদের শুভানুধ্যায়ী। তাঁর দরকার ছিল এদের সাহায্যের, অতি উন্নত, কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু দ্রাবিড় গোষ্ঠীগুলির উদ্ধারের জন্য। ময়দানব দ্রাবিড়, কিন্তু মহাস্থপতি। রামায়ণের রাবণও দ্রাবিড়। তবে শ্রীকৃষ্ণের আগে আর-এক জন এসেছিলেন অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি ভীষ্ম। তাঁর বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র, যা পাণ্ডবদের নয়, উত্তরভারতের কারও নয়, উগ্রক্ষত্রিয়দের। এই উগ্রক্ষত্রিয় কারা? রাজস্থানের একটি ক্ষীয়মান গোষ্ঠীর উত্তরসূরি। কিন্তু ভীষ্ম সফল হলেন না। কেন!

শ্রীকৃষ্ণ দ্রাবিড় হলেও তিনি সম্ভবত ব্যক্তিগত ভাবে এত উন্নত মননের আধার, যা আর্য স্তরের ঋষিদেরও কল্পনার অতীত। তিনি উত্তরভারতে সভ্যতার আসন্ন বিনাশ মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর গুরু সন্দীপন মুনি, যিনি ঋষি নন। ইনি কোন ঋক্ সৃষ্টি করেননি, কিন্তু মনোরাজ্য যে সন্দীপিত করা যায়, সে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। এই বিদ্যার উত্তরসূরি পঞ্চশিখ, যোগশাস্ত্রের আদিগুরু। পতঞ্জল, কপিল এই ধারার বাহক ও অনুশীলক। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করে ব্রাহ্মণ ও ঋষি হন। তিনিও দ্রাবিড়। গায়ত্রী মন্ত্র তাঁর রচিত ঋক্। ত্রসদস্যু এমন আরেক দ্রাবিড় ঋষি, যিনি আর্য স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। সে যুগে সভ্যতার যে-নঞর্থক মেরু গড়ে উঠেছিল, তা বিচূর্ণ করে সভ্যতার অগ্রগতির অনন্ত সম্ভাবনাক্ষেত্রের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সেটাকেই বাস্তবে রূপ

দেওয়ার জন্য এই পঞ্চজনকে বেছে নিয়েছিলেন, আজকের ভাষায় যাদের জনজাতি বলা সঠিক হবে। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য তাই ব্যক্ত করেছিলেন এই শ্লোকে : *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥* গীতার এই শ্লোকে তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় রূপে প্রকাশ করলেন।

রামায়ণে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, এঁরাও দ্রাবিড়, কিন্তু যোগী। পুলহ ও পুলস্ত্য এঁদের মাতামহ ও পিতামহ, কিন্তু ঋষি। এই সব তথ্য থেকে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের আগেই আর্য সভ্যতা উন্নত দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। এটা হয়ে থাকা অসম্ভব নয়, কারণ পুলহ নামটার মধ্যে হ্যামিটিক উচ্চারণের রেশ আছে। রাবণের বাড়বাড়ন্ত, তাঁর পুত্রদের ঔদ্ধত্য দেখে মনে হয় দ্রাবিড় সভ্যতা হলেও তাঁর অবস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল নঞর্থক মেরুতে, তবে সে মেরু আর কৌরবদের নঞর্থক মেরু সমগোত্রীয় নয়। রাবণের দ্রাবিড় সভ্যতা একদিকে অন্তর্মিলনে যেমন জীর্ণ, তেমনি অহঙ্কারে দীর্ণ। তার পুনরুজ্জীবনের জন্য দরকার বিশুদ্ধ রক্ত ও নতুন ভূভাগ জয়। সীতাহরণ ও শূর্পনখার লক্ষ্মণকে বিবাহের প্রস্তাব মনে হয় তারই ইঙ্গিতবহ। কোন-কোন দ্রাবিড় ক্ষত্রিয় নিজেদের চেষ্টায় শুধু আর্য স্তর নয়, একবারে ঋষির পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। যেমন বিশ্বামিত্র, ত্রসদস্যু। এঁরা একলব্যের মতো, বর্ণসংকর নন।

উনি বোধ হয় ভাবলেন আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না। বললেন, আচ্ছা, স্কুলে প্রোমোশনের কথা ভাবুন! সেখানে ওপরের ক্লাসে ওঠাটা স্বভাবসুলভ, অর্থাৎ উন্নয়নটা স্বাভাবিক। তবে তার জন্য অধ্যয়ন করতে হয়, আর সেটাই সেখানে কর্ম। সেটা না-হলে একই ক্লাসে থেকে যেতে হয়, যেখানে একাধিক বছর থাকলে শেষে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। পড়াশোনা আর হয় না। সমাজের ব্যক্তিসমষ্টির ক্ষেত্রে তার অবস্থার ক্রমিক উন্নতি না-হয়ে অবনতি ঘটে। আবার যখন এক ক্লাস নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন তৈরি হয় সংকর। কারণ তার সহযোগীরা বয়ঃকনিষ্ঠ বলে সে হয় হীনম্মন্যতার শিকার। অফিসেও এই ধরনের ব্যাপার হয়।

স্বামীজি মহাভারত থেকে রামায়ণে ঢুকে যাবার উপক্রম করতে আমি বলি, মহাভারতের কথা হচ্ছিল যে! স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ! পঞ্চজনের নেতা রূপে তাঁর বিউগ্‌ল বা তূর্য হল পাঞ্চজন্য। ধাতু ব্যবহারের প্রচলন ততটা না-থাকায় স্বভাবতই তা বিশেষ ধরনের শঙ্খ।

আমি ভাবছিলাম। উনি ধরে ফেললেন, বললেন, ভাবছেন এই সব পঞ্চজন আর কৌরবদের কাহিনীর আপনি পার্শ্বচরিত্র হলেন কী করে, তাই না? আমি সত্যি তা-ই ভাবছিলাম। হমো সেপিয়েন্‌স পর্যন্ত ঠিক ছিল, আমিও তো তার উপপ্রজাতির জীব, হমো সেপিয়েন্‌স সেপিয়েন্‌স। কিন্তু তার সঙ্গে মহাভারতের চরিত্রগুলির কী

সম্পর্ক! স্বামীজি বলেন, ধৃতরাষ্ট্র থেকে অশ্বত্থামা, সবাই আপনার পাড়ায় আছেন, এমনকী আপনার পরিবারেও থাকতে পারেন। একটু ভাবলেই তাদের আলাদা করে চিনে নিতে পারবেন।

অনেকটা সময় দিলেন উনি চিনে নেবার জন্য। মনে পড়ল এক নয়, অনেক ধৃতরাষ্ট্রের কথা, ছেলেকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে যাঁরা মাথায় তুলে থাকেন সে রকম পিতার কথা, অশ্বত্থামার মতো অনেক বর্বরের কথা, বিকর্ণ ছাড়া দুর্যোধন ও তার ভাইদের কথা, ভীষ্ম দ্রোণের মতো প্রাজ্ঞ হয়েও অন্নদাস বলে যাঁরা দুর্যোধনদের চির আজ্ঞাবহ, তাঁদের কথা। কিন্তু একজনকেও পেলাম না, যিনি ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী হয়েও অবস্থার ফেরে নঞর্থক বা negative কৌরবদের সপক্ষে। একলব্যের মতো আর কাউকে পেলাম না, যদিও এ যুগে একাধিক একলব্যেরই নাম করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের কথা তোলার আগেই বললেন, আর কৃপাচার্য? কৃপাচার্যের মতো ব্যক্তিত্ব কি পেয়েছেন আপনার চেনার মধ্যে? বলি, চেনার মধ্যে পাইনি, তবে পরিচিতদের মধ্যে পেয়েছি, লালবাহাদুর শাস্ত্রী। আরিয়ালুরে রেলব্রিজ ভেঙে পড়ে প্রায় দেড় শ' যাত্রীর মৃত্যুর সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে উনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। আর বইতে পড়েছি সক্রেটিসের কথা, যিনি বলেছিলেন এমন কথা, যার ঔপনিষদিক রূপ *আত্মানং বিদ্ধি*। তবে একটা প্রশ্ন মনে উঠছে, উপনিষদে সক্রেটিসের উক্তি আসে কী করে, নাকি সক্রেটিসের কাছে উপনিষদ পৌঁছেছিল?

উনি হেসে ফেলে বলেন, যা ধ্রুব সত্য, তা সব সদর্থক মানুষের চিদাকাশে আসবেই। কিন্তু আপনি বিদুরের কথা তো বললেন না! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বললেন, নেহাত দাসীর গর্ভে জন্মেছিলেন বলে তিনি কৃপাচার্য বা চিরঞ্জীব হতে পারলেন না। কিন্তু তিনিও যুদ্ধের আগে পদত্যাগ করেছিলেন। ভালো কথা, এই চিরঞ্জীবদের তাৎপর্য সম্বন্ধে কখনও ভেবেছেন কিছু? বলি, মনে হয়েছে ও মহাকাব্যের রূপকথা, অলঙ্করণের জন্য কল্পিত। স্বামীজি স্মিত হাস্যে বললেন, না, তা নয়! এরা প্রত্যেকে মানুষের বিশেষ-বিশেষ সত্তা। ব্যাস সম্বন্ধে আগেই বলেছি। মানুষ যত দিন থাকবে, ব্যাসকেও থাকতে হবে, নইলে পূর্ব-পূর্ব জ্ঞান কে বুঝিয়ে দেবে! অশ্বত্থামা তেমনি বর্বরতার প্রতিমূর্তি, যুগে-যুগে তার আবির্ভাব অকল্পনীয় ত্রাসসঞ্চারের জন্য। কৃপাচার্যরা তেমনি কোন অবস্থাতেই নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দেন না। হনুমান গীতার ভক্তিযোগের আদর্শ সত্তা। আর অন্যান্যরা রামায়ণের চিরঞ্জীব, তাদের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। মানুষ থাকলে তাদের মধ্যে এঁরাও থাকবেন।

তারপরই জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, আপনি গীতা পড়েছেন?